১ আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব

আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত অস্তিত্ব। তিনি ছাড়া বাকী যা কিছু আছে সে সমস্তকে আল্লাহ্পাকই অস্তিত্বে এনেছেন। সুতরাং স্বয়ং অস্তিত্ব যিনি, তিনিই আল্লাহ্। তিনি খালেক (স্রষ্টা)। আর তিনি যাদেরকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন তারা মাখলুক (সৃষ্টি)।

আল্লাহ্পাকের জাত (সত্তা ও অস্তিত্ব) এক, অদ্বিতীয়। তাঁর সিফাত (গুণাবলী) এক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর আফআ'ল (কার্যাবলী)ও এক, অদ্বিতীয়। তাঁর অস্তিত্ব, গুণাবলী ও কাজ, সৃষ্টির অস্তিত্ব, গুণাবলী এবং কাজের মতো নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো বিষয়ে কেউ বা কোনো কিছু তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত নয়। অংশীও নয়। না অস্তিত্বের বিষয়ে। না গুণাবলী বা কাজের বিষয়ে।

আল্লাহ্পাকের জাত প্রকারবিহীন (বে-মেছাল)। তাঁর সিফাতও বে-মেছাল। তেমনি তাঁর কার্যকলাপও বে-মেছাল। সৃষ্ট বস্তুসমূহের জাত, গুণ ও কাজের সঙ্গে তাঁর কোনোই সম্বন্ধ নেই।

২ আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী/'এলেম' গুণ

আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর আলোচনায় প্রথমে 'এলেম' গুণটির কথাই ধরা যাক। আল্লাহ্পাকের এই গুণ অনাদি এবং অবিভাজ্য। তাঁর এই 'জ্ঞান' গুণটির সঙ্গে বহু বিষয়ের সম্বন্ধ আছে। তবুও মূলে কিন্তু একাধিকতার অবকাশ নেই। যেহেতু তাঁর

'এলেম' একটিমাত্র অবিভাজ্য বিকাশ। আর ওই অবিভাজ্য ও অতুলনীয় বিকাশ থেকে আদি-অন্তের সকল জানিত বস্তু বিকশিত হয়েছে।

আল্লাহ্তায়ালা সকল সৃষ্টবস্তুকে তাদের অনুকূল ও প্রতিকূল সকল অবস্থায় সমষ্টিগত বা আংশিকভাবে সংশ্লিষ্ট সময়ের চলমানতায় এক অবিভাজ্য মুহূর্তেই জানেন।

যেমন– জায়েদ নামক কোনো ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু, অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব– তাঁর ভ্রুণজাত অবস্থা, শিশু অবস্থা, যৌবন, বার্ধক্য, জীবনাবসান– তার দণ্ডায়মানতা, উপবেশন, শয়ন– তার আনন্দ, বেদনা, সম্মান, লজ্জা– তার কবরজীবন, হাশর জীবন, বেহেশত অথবা দোজখ জীবন– সবকিছুই তাঁর একই মুহূর্তের জ্ঞাতব্য ব্যাপার। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার জন্য একাধিক সম্বন্ধ নেই। একাধিক সম্বন্ধের জন্য বিভিন্ন মুহূর্তের বা সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার জন্য সৃষ্টির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এক অবিভাজ্য মুহূর্ত ব্যতীত অন্যকিছুই নেই। একাধিকতা এখানে অস্তিত্বহীন। কেননা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কোনো সময় অতিবাহিত হওয়া অসম্ভব। তাঁর জন্য অগ্র-পশ্চাৎ বলে কিছু নেই। সুতরাং তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে যদি জানিত বস্তুসমূহের সম্বন্ধ লক্ষ্য করি, তবে সেই সম্বন্ধকেও আমরা সকল জানিত বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত দেখতে পাবো। আর ওই সম্বন্ধও হবে তাঁর এলেম গুণের মতো অতুলনীয়, অবিভাজ্য এবং প্রকারবিহীন।

যেমন একটি উদাহরণ– একজন পাঠক একই সঙ্গে বাক্যস্থিত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জনবর্ণ, দেশী শব্দ, বিদেশী শব্দ, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে পালনীয় অনুজ্ঞা– ইত্যাকার অনেক অবস্থা একই সঙ্গে জানতে পারে। একই বাক্যের আধারে অক্ষর ও শব্দাবলীর বহু বিচিত্র সম্মিলিত অবস্থা একই মুহূর্তে দেখা যদি সৃষ্টজীবের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে অবশ্যম্ভাবী এবং অতুলনীয় আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে নিশ্চয় তা সম্ভব।

এখানে শাদা সরল দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বস্তুসমূহের একত্রীকরণ মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে বিষয়টি পরস্পরবিরোধী বস্তুর একত্রায়ণ নয়। বরং পরস্পরবিরোধী অবস্থাসমূহকে একই সঙ্গে জানার ব্যাপার। কেননা, আল্লাহতায়ালা যদিও একই মুহূর্তে জায়েদ নামক ব্যক্তিকে অস্তিত্বধারী ও অস্তিত্বহীন জানেন– কিন্তু সেই মুহূর্তে একথাও জানেন যে, জায়েদের আবির্ভাব অমুক সময়ে হাজার বছর আগে বা পরে। তারপর তার পৃথিবীর জীবন শুরু। আবার পঞ্চাশ, আশি বা একশ' বছর পর তার মৃত্যু। এবার বুঝা গেলো, এখানে জায়েদের জন্ম-মৃত্যুকে একত্রিত করা হয়নি। বরং তার জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ একই মুহূর্তে জানা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, শুধু জায়েদের বিষয় নয়। সমস্ত সৃষ্টির

সকল বিষয়ই আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানে এক, অতুলনীয় এবং অবিভাজ্য মুহূর্তে প্রতিভাত বা প্রতিভাসিত।

জানা আবশ্যক, আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান পরিবর্তনশীল নয়। এতে নতুনত্বও নিবারিত। ভ্রান্ত দার্শনিকেরা মনে করে, একটির পর একটি বিষয় আল্লাহ্তায়ালার অবগতিতে আসে। কিন্তু এরকম অসম্ভব। ক্রমাগত জ্ঞান লাভ নয়, একই মুহূর্তে সমগ্র সৃষ্টির আদি-অন্তের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় যেহেতু আল্লাহ্তায়ালার জানা, তাই পরিবর্তনশীলতা এবং নতুনত্বের ধারণা এখানে অস্তিত্বহীন। একাধিক সম্বন্ধ, নতুনত্ব এবং পরিবর্তনশীলতা সৃষ্টির দিক থেকে হয়। সৃষ্টির জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আর আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান অসীম, অতুল, উদাহরণবিহীন।

৩ 'কালাম' গুণ

আল্লাহ্তায়ালার আর একটি গুণ 'কালাম'। কালাম অর্থ কথা বা বাক্য। আল্লাহ্তায়ালা কলীম (বাক্যধারী)। তাঁর কালাম বা বাক্যও অবিভাজ্য। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তিনি ওই একটি বাক্যের বক্তা। আদেশ, নিষেধ, বিজ্ঞপ্তি, জিজ্ঞাসা, জবাব– সমস্তকিছুই ওই এক, অতুলনীয় ও অবিভাজ্য বাক্যের প্রকাশ। রসুল আ. গণের প্রতি যে সকল কিতাব ও সহিফা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো উক্ত অবিভাজ্য বাক্যের কোনো এক পৃষ্ঠা সদৃশ। তওরাত কিতাবের প্রতিলিপি করা হয়েছে সেখান থেকেই। ইঞ্জিলও সেখান থেকে লাভ করেছে অক্ষরের আকার। যবুরও সেখান থেকে আগত। কোরআন শরীফও।

প্রকৃত কালাম এক, মহান আল্লাহর
অবতীর্ণ হলো ধরে বিভিন্ন আকার।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'লাইসা কামিছলিহী শাইউঁও ওয়া হুয়াস্ সামিউল বাসীর'। অর্থ– কোনোকিছুই তাঁর অনুরূপ নয় এবং তিনি শ্রবণশীল, দ্রষ্টা।

এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সত্তাগতভাবে তিনি (আল্লাহ্) যেমন অতুলনীয়, এক, অবিভাজ্য– গুণাবলীতেও তেমনি। আর নমুনা হিসাবে এখানে দু'টি গুণের

(সামা ও বাসার) উল্লেখ করা হয়েছে। এলেম, কালাম, সামা, বাসার– তাঁর এরকম সকল গুণাবলীকেই জানতে হবে আনুরূপ্যহীন, এক এবং অবিভাজ্য।

৪ আল্লাহ্তায়ালার কাজ

আল্লাহ্তায়ালার কাজসমূহও তেমনি। তাঁর আফআ'ল অর্থাৎ কার্যাবলীও এক। সৃষ্টির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সকল সৃষ্ট পদার্থ ওই এক কাজ দ্বারাই সৃজিত হয়েছে। এখনো হয়। আগামীতেও হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ এরকম–

"এবং আমার আদেশ, একই আদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়, যেমন– চোখের একটি পলক" (সূরা ক্বমার ৫০ আয়াত)। জীবিতকরণ অথবা মৃত্যুপ্রদান ওই এক-অদ্বিতীয় কাজের উপরেই নির্ভরশীল। কষ্ট প্রদান অথবা অনুগ্রহ প্রদানও তেমনি। সৃজন কিংবা ধ্বংস– এরকম সকল কাঙ্খিত অথবা অনাকাঙ্খিত কাজ ওই এক কাজেরই বিভিন্ন বিকাশ। মোট কথা, আল্লাহ্তায়ালার কাজের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ নেই। বরং এক সম্বন্ধের ফলেই অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সমুদয় সৃষ্টি আপন আপন অস্তিত্ব, স্থিতি অথবা বিলয় লাভ করে চলেছে। আর ওই সম্বন্ধটিও অতুলনীয়, অবিভাজ্য এবং আকার-প্রকারহীন। অপরপক্ষে সৃষ্টি (মাখলুক) আকার প্রকারের বৃত্তে আবদ্ধ এবং সতত পরিবর্তনশীল। সুতরাং আকারসম্ভূত বস্তু আকারাতীত আল্লাহ্তায়ালার দিকে দৃষ্টিবিক্ষেপ করতে অক্ষম। চিন্তাবিক্ষেপ করতেও অপারগ।

আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টিকরণ গুণকে তাকবীন বলা হয়। এই তাকবীন বা সৃষ্টিকরণ গুণকে ইমাম আবুল হাসান আশআরী র. নতুন বলেছেন এবং আল্লাহ্তায়ালার কার্যকলাপসমূহকে নতুন সৃষ্টি বলে ধারণা করেছেন। এই ধারণা ভুল– একথা বলেছেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দি র.। তিনি বলেন, নতুন যা, তা হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সিফাতে তাকবীনের (সৃষ্টিকরণ গুণের) ক্রিয়া বা ফল মাত্র। অবিকল তাঁর সৃজনগুণ 'তাকবীন' নয়।

আবার কোনো কোনো সুফী তাজাল্লিয়ে আফআ'ল অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার কার্যকলাপের আবির্ভাব সম্পর্কে বলেছেন, তাঁরা সকল সৃজিত বস্তুর মধ্যে এক

আল্লাহ্তায়ালার কাজ ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না। এঁদের ভুলও ইমাম আশআরীর ভুলের মতো। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যা দেখেন, তা আল্লাহতায়ালার এক, অনাদি, অতুলনীয়, অবিভাজ্য আকার-প্রকারহীন সৃষ্টিকরণ গুণ অর্থাৎ সিফাতে তাকবীনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল। অবিকল আল্লাহ্তায়ালার কাজের তাজাল্লী নয়। আল্লাহ্তায়ালার কাজ তাঁর পবিত্র অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং আকার, প্রকার এবং আদিসম্ভুত সৃষ্টির দর্পনে তার সংকুলান এবং অবস্থান সম্ভব নয়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন 'এ ফকিরের নিকট আল্লাহতায়ালার কার্যকলাপ ও গুণাবলীর (আফআল ও সিফাতের) তাজাল্লী বা আবির্ভাব তাঁর পবিত্র অস্তিত্বের (জাতের) তাজাল্লী থেকে বিচ্যুত হওয়া অসম্ভব। জাত থেকে যা বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয়, তা তাঁর গুণাবলী ও কার্যাবলীর প্রতিবিম্ব (জেল)। মূলবস্তু এবং তার প্রতিবিম্ব নিশ্চয়ই এক নয়। কিন্তু সকলের জ্ঞান এই পূর্ণস্তরে পৌঁছতে পারে না'। 'এটা আল্লাহ্তায়ালার প্রতুল অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আল্লাহ্পাক অতি উচ্চ অনুকম্পাপরবশ'। আল কোরআন।

৫ সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক ঃ এক

আল্লাহ্তায়ালা কোনোকিছুর মধ্যে প্রবেশ করেন না। কোনো বস্তুও তাঁর ভিতরে প্রবিষ্ট হতে পারে না। তিনি সকল সৃষ্টিকে ঘিরে আছেন। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর নিকটতা আছে, সংশ্লিষ্টতা আছে। কিন্তু বেষ্টন, নৈকট্য এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান যা ধারণা অথবা অনুমান করতে পারে, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কারণ সীমার ধারণা সীমানাতীত দরবারের উপযোগী হতে পারেই না। আধ্যাত্মিক সাধকেরা আত্মিক দর্শনে (কাশফে) যা অবলোকন করেন, তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। সৃষ্টি (মাখলুক) তাঁর অস্তিত্ব, গুণনিচয় এবং কাজের পরিচিতি লাভ করতে গিয়ে অজ্ঞতা, অক্ষমতা এবং অসহনীয় ও বিস্ময়বিমূঢ় পিপাসা ব্যতীত আর কিছুই লাভ করতে পারে না। তাই দৃষ্ট, শ্রুত এবং জ্ঞাত নয়– এরকম পবিত্র জাতের প্রতি অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

কালামুল্লাহ্ শরীফে তাই বর্ণিত হয়েছে, 'ইউ'মিনূনা বিল গয়ীব' (যারা অদৃশ্যের উপরে আস্থা স্থাপন করে)।

সুফী সম্প্রদায়কে এই কথাটা ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে। কারণ বহুবিচিত্র আত্মিক বিকাশ বা কাশফ তাঁদের আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমায় প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সে সকল দর্শিত, শ্রুত এবং জ্ঞাত বিষয়কে অনুক্ষণ আবৃত্তিশীল কালেমার 'লা' (না) দ্বারা মুছে ফেলতে হবে।

আনকা ফাঁদে পড়বে না, ফাঁদ নাও তুলে
ফাঁদে শুধু শূন্য বাতাস, ভরা আশার ভুলে।

আমাদের হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর একটি রুবায়ী (চতুর্পদী) কবিতাও এরকম অবস্থার সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

সে মহান আল্লাহর পবিত্র আনন
এখনো অনেক দূরে তাহার কানন
পেয়েছি এবার আমি তাঁর সন্নিধান
অপছন্দ করি আমি এই অনুমান।

অতএব, আমাদের বিশ্বাস এরকম থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ সকল বস্তুকে বেষ্টনকারী, সকলের নিকটবর্তী এবং সকলের সঙ্গে আছেন। কিন্তু এই বেষ্টন, নৈকট্য ও সঙ্গতার প্রকৃত অর্থ আমাদের জানা নেই। এলেম বা জ্ঞান কর্তৃক বেষ্টন, নৈকট্য এবং সঙ্গতা– এরকম বলাও সমীচীন নয়। কারণ এরকম অর্থ করা মোতাশাবেহ্ বা অবোধ্য আয়াতের অর্থ করার মতো।

৬ সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক ঃ দুই

আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টির সঙ্গে একীভূত হন না। সৃষ্টিও তাঁর সঙ্গে একীভূত অথবা সমীভূত নয়। কোনো কোনো সুফীর কথায় বোঝা যায়, একীভূতি অথবা সমীভূতি সম্ভব। কিন্তু প্রকৃত অর্থ অন্যরকম। যেমন, 'ফকর' বা মুখাপেক্ষিতার যখন শেষ হয় তখন তা-ই আল্লাহ্– এ বাক্যের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ফকর অথবা

মুখাপেক্ষিতার শেষে যখন কেবল নাস্তি বা শূন্যতা লাভ হয়, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকিছু অবশিষ্ট থাকে না। অথচ মূর্খ ব্যক্তিদের ধারণা, ফকির বা মুখাপেক্ষী ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে একাকার হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ হয়ে যায়। এরকম বিশ্বাস কুফরী এবং বেদ্বীনি। আল্লাহ্তায়ালা জালেমদের এরকম অসৎ বিশ্বাস থেকে মুক্ত ও পবিত্র। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. বলেছেন 'আনাল হক' বাক্যের অর্থ এরকম নয় যে 'আমিই হক' বা 'আমিই আল্লাহ্' বরং এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে– আমিতো আমার অস্তিত্বের আধার হারিয়ে ফেলেছি আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের আলোকচ্ছটায়। এখন অবস্থা এই যে– আমি নেই। আল্লাহ্ই আছেন। এই 'আমি' উচ্চারণ আমার অস্তিত্ব থেকে নয়। আল্লাহ্তায়ালার দিক থেকে। আমার অবস্থা এখন মুসা আ. এর সেই বৃক্ষের মতো, যে বৃক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছিলো, 'ইন্নানি আনাল্লাহ্ .....' (নিশ্চয় আমিই আল্লাহ্.....)। বৃক্ষ এখানে ঘোষক মাত্র। অথবা মাধ্যম, যেমন মাইকের হর্ণ বক্তার কথা প্রকাশের মাধ্যম হয়।

৭ আল্লাহ্তায়ালার অপরিবর্তনশীলতা

আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বে, গুণে এবং কাজে কোনোরকম পরিবর্তন ঘটে না। অথচ সৃষ্টি নিত্য পরিবর্তনশীল, লয়, ক্ষয় ও বিবর্তনের অধীন। পবিত্র ওই জাত যাঁর জাত, সিফাত ও আফআল সৃষ্টির মতো পরিবর্তনশীলতা এবং নতুনত্বের কলংক থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

অজুদিয়া মতাবলম্বী সুফীগণ 'তানায্যুলাতে খামছা' নামের যে পঞ্চস্তরের বিবরণ দিয়েছেন, তা ওয়াজিবুল অজুদ বা অবশ্যম্ভাবী মর্যাদার মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার জাত, সিফাত ও আফআলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এরকম ধারণা অবিশ্বস্ত এবং ভ্রান্ত। উক্ত পঞ্চস্তরের অনুমান আসলে জাত, সিফাত ও আফআ'লের তাজাল্লি বা আবির্ভাবের জেল অর্থাৎ ছায়া-প্রতিচ্ছায়ার প্রতি

আরোপযোগ্য। আর একথা অকাট্য ও সন্দেহাতীত যে, প্রতিচ্ছায়াগত পরিবর্তন মূল বিষয়ের উপরে কোনোই প্রভাব রাখে না।

৮ অমুখাপেক্ষিতা

আল্লাহ্তায়ালা গনী। অর্থাৎ শর্তহীন অভাবশূন্য। অস্তিত্বে, গুণে, কাজে সকল কিছুতেই তিনি গনী। কোনো বিষয়েই তিনি অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অস্তিত্বে যেমন তিনি অমুখাপেক্ষী, তেমনি আবির্ভাব ও প্রকাশের বিষয়েও তিনি অমুখাপেক্ষী। যে সকল সুফী বলেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নাম ও গুণাবলীর (ইসিম ও সিফাতের) পূর্ণতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সৃষ্টির মুখাপেক্ষী, তাঁরা ভুল বলেন। এরকম বাক্য উচ্চারণ করা মস্ত অন্যায়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নিজেদের পূর্ণতা অর্জনের জন্যই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা যিনি সত্তাগতভাবে স্বয়ংপূর্ণ, তাঁর পূর্ণতা লাভের তো প্রশ্নই আসতে পারে না।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন–

'আমি জ্বিন ও মানুষকে ইবাদত করা (আমার পরিচয় বা মারেফাত লাভ করা) ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'। সূরা জারিয়াহ্, ৫৬ আয়াত।

এখানে এবিষয়টি পরিষ্কার যে, জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই– যেনো তারা আল্লাহ্তায়ালার মারেফাত লাভের অভিলাষী হয় এবং পূর্ণতা অর্জনে ধন্য হয়। হাদিসে কুদসীর ভাষ্য 'আমি গুপ্ত ধনভাণ্ডার। পরিচিত হওয়ার জন্যই আমি সৃষ্টিকে অস্তিত্বদান করেছি'। কথাটির অর্থ এই যে, সৃষ্টি যেনো পরিচয়প্রাপ্ত হয়ে তাদের জন্য নির্ধারিত পূর্ণতা অর্জনে ধন্য হয়। এরকম মনে করা অন্যায় যে– আমি আল্লাহ্ সৃষ্টির নিকট পরিচিত হই এবং এই পরিচিতির কারণে আমার কিছু পূর্ণতা

সাধিত হয়। আল্লাহ্তায়ালা গনী। অমুখাপেক্ষী। সুতরাং বর্ণিত অসৎ ধারণা থেকে তিনি অতি উচ্চ, পবিত্র ও মহান।

৯ পূর্ণতা

আল্লাহ্তায়ালা সকল রকম ক্ষতি, বিনষ্টি ও নতুনত্বের কালিমা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি শরীরধারী নন। স্থান এবং কালসম্ভূতও নন। সকল পূর্ণতা তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান। বরং বলা যায় পূর্ণতা তিনিই। সৃষ্টি তার নিজস্ব ধরনের পূর্ণতা তাঁর অনুগ্রহেই পায়। তাঁর আটটি পূর্ণগুণ এমন যে, ওই গুণগুলি তাঁর মধ্যে অতিরিক্ত অস্তিত্ব অনুযায়ী অস্তিত্বশীল। ওই গুণাবলী হচ্ছে ১. হায়াত (জীবন) ২. এলেম (জ্ঞান) ৩. কুদরত (ক্ষমতা) ৪. এরাদা (ইচ্ছা) ৫. সামা (শ্রবণ) ৬. বাসার (দর্শন) ৭. কালাম (বাক্য) ৮. তাকবীন (সৃজন)। এই গুণসমূহ বাস্তব। কাল্পনিক বা ধারণাসম্ভূত নয়। এই গুণ অষ্টক প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ্তায়ালার জাতের সঙ্গে অতিরিক্ত অস্তিত্ব হিসাবে বর্তমান।

এ ব্যাপারে মোতাজিলা দার্শনিকেরা এবং অজুদিয়া সুফীরা মনে করেন, ওই গুণ অষ্টকের অস্তিত্ব রয়েছে শুধু জ্ঞানে এবং ধারণায়। বাস্তবে জাতের সঙ্গে এক বা একাকার। কিন্তু উপরোক্ত গুণ অষ্টকের বাস্তব অস্তিত্বের স্বীকার না করা পর্যন্ত বিশ্বাসী হওয়ার উপায় নেই। বরং এরকম যারা করবে, তারা আল্লাহ্তায়ালার সিফাতের প্রতি অবিশ্বাসী বলে বিবেচিত হবে।

১০ আদি-অন্ত হীনতা

আল্লাহ্তায়ালা আদি-অন্তশূন্য। নিরারম্ভ এবং নিঃসমাপ্ত। তিনি ছাড়া অনাদি, অনন্ত বলে আর কিছু নেই। আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া অন্য কোনোকিছুকে যদি কেউ অনাদি অনন্ত বলে, তবে সে কাফের। এই কারণেই ইমাম গাজ্জালী র. ইবনে সিনা, ফারাবী এবং তাঁদের মতো অন্যান্য দার্শনিকদেরকে কাফের বলেছেন। কেননা তাঁরা 'দশ আকল' অর্থাৎ জ্ঞান নীতি এবং নফস বা প্রাণকে অনাদি বলেছেন এবং হাইউল বা প্রত্যেক বস্তুর মূল আকার-আকৃতিকে (সুরত) অনাদি বলে ধারণা করেছেন। আবার আকাশ এবং তাতে যা কিছু আছে, তার সবকিছুকেও অনাদি বলেছেন।

হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. বলেছেন 'শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর অভিমত এরকম যে, কামেল ব্যক্তিগণের রূহ অনাদি– এরকম বাক্যের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণীয় নয়। বরং এর ভাবার্থ গ্রহণ করাই সমীচীন, যাতে সকল সুষ্ঠু মতামতের মধ্যে ঐক্যের সূত্র অটুট থাকে'।

১১ সর্বশক্তিমানতা

আল্লাহ্তায়ালা সর্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময়। ঔচিত্য ও বাধ্যতা তাঁর প্রতি আরোপিত হয় না। হতে পারে না। অজ্ঞ দার্শনিকেরা অবশ্য বলেন অন্যকথা। তাঁদের মতে সক্ষম ব্যক্তি যেমন কাজ করতে বাধ্য, আল্লাহ্তায়ালাও তেমনি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আল্লাহ্পাক সর্বশক্তিমান, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তিনি শক্তি প্রদর্শন করতে এবং সৃষ্টি করতে বাধ্য নন। আল্লাহ্পাকের এরশাদ এরকম–

'ফাআ'লুললিমা ইউরিদ' (নিশ্চয় তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন)।

ওই দার্শনিকেরা যতই খ্যাতিমান হোন না কেনো, আদতে তারা মূর্খই। তারা তো মনে করেছে, বাধ্যতামূলকভাবে সৃষ্টিজগতকে সৃজনের পর অবশ্যম্ভাবী জাতপাকের আর কাজ নেই। আর প্রাত্যহিক কাজ ও ঘটনা সৃষ্টি করে 'আকলে ফায়াল' (কার্যকরী জ্ঞান যা প্রথম স্তরে অবস্থিত)। এই আকলে ফায়ালের অস্তিত্ব রয়েছে কেবল তাদের কষ্টকল্পনায়। বাস্তবে নয়। তাদের বিকৃত ধারণা অনুযায়ী

যেনো আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধই নেই। তাই তারা বিপদ ও কষ্টের সময় বাধ্য হয়ে আকলে ফায়ালের আশ্রয়প্রার্থী হয়। আল্লাহ্‌পাকের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করে না। কারণ, তাদের অসৎ বিশ্বাসে প্রাত্যহিক কার্যকলাপে আল্লাহ্‌তায়ালা অধিকারহীন। প্রকৃতপক্ষে তারা আকলে ফায়ালের প্রতিও মনোযোগী নয়। কারণ বিপদ দূর করতে আকলে ফায়ালেরও নাকি কোনো অধিকার নেই। এরকমই ধারণা তাদের। এরা মূর্খতা ও বোকামিতে সকল পথভ্রষ্ট দলের নেতৃস্থানীয়। যারা কাফের, তারাও বিপদে আপদে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং তাঁর নিকটই বিপদমুক্তি কামনা করে।

যতরকম পথভ্রষ্ট দল আছে, তাদের মধ্যে এ সকল বোকা দার্শনিকদের ভিতর দু'টি অতিরিক্ত ভ্রষ্টতা আছে। ১. তারা আল্লাহ্‌তায়ালার অবতারিত হুকুম এবং সংবাদ (ওহী) অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, ওহীর সঙ্গে শত্রুতা ও হিংসা রাখে। ২. তাদের অর্থহীন উদ্দেশ্যের সমর্থনে কতকগুলি ব্যর্থ মুখবন্ধ উপস্থাপনের প্রয়াস পায়। মিথ্যার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ দিতে গিয়ে তারা হয়েছে প্রায় পাগল এবং বিকৃতমস্তিষ্ক। তারা মনে করে, আকাশ এবং নক্ষত্রমণ্ডলী সকল কাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। আকাশ এবং নক্ষত্র-নীহারিকার স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও বিধানদাতা যিনি, সেই পবিত্র এক আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের কোনো খেয়ালই নেই। এরা সত্যিই বিস্ময়কর হতভাগ্যের দল। এদের চেয়েও অজ্ঞ ওই ব্যক্তিরা, যারা এদেরকে জ্ঞানী মনে করে।

এ সকল দার্শনিকদের চর্চিত বিদ্যার মধ্যে একটি হলো জ্যামিতি। মানুষের বিশাল বিস্তৃত জীবনপরিসরে (আলমে আরওয়াহ্ থেকে আখেরাত) এই বিষয়টির তেমন কোনো গুরুত্বই নেই। ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান– এরকম জ্ঞান কোন কাজে লাগে? তাদের মর্মস্পর্শী প্রতিজ্ঞা হচ্ছে– শাকলে আরছি (৪৭ প্রতিজ্ঞা) এবং শাকলে মামুনী (৫ম প্রতিজ্ঞা)। এসকল প্রতিজ্ঞা করেই বা কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হয়? তাদের বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবলী হচ্ছে এলমে তিব বা শরীরতত্ত্ব শাস্ত্র, এলমে নজুম বা নক্ষত্রবিদ্যা এবং চরিত্র সংশোধনবিদ্যা। এ সমস্ত এলেম পূর্ববর্তী রসুলগণের কিতাব থেকে তারা অপহরণ করে নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়টি ইমাম গাজ্জালী র. তাঁর 'আল মুনকিজ আনিদ্দ্বালাল' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

দ্বীনদার ব্যক্তিরা নবী-রসুলগণের পথপ্রদর্শনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁরা দলিল-প্রমাণে ভুল করলেও ক্ষতি নেই। কারণ তাঁদের নির্ভরতা পয়গম্বরগণের অনুসরণের উপর। দলিল প্রমাণ তাঁরা উপস্থাপন করেন প্রয়োজনবশত বিরুদ্ধবাদীদের ধারণা পরিস্কৃতির জন্য, অথবা আত্মকৌতুহল নিবারণের জন্য। কিন্তু মূর্খ দার্শনিকেরা এর বিপরীত। তারা পয়গম্বর আ.গণের অনুসরণ স্বীকার

করে না। তাদের পূর্ণ নির্ভরশীলতা যুক্তি-প্রমাণের উপরেই– যা খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ, সন্দিগ্ধ, অসম্পূর্ণ বেং সিদ্ধান্তবিবর্জিত। এরা নিজেরা তো ভ্রষ্টই। একই সাথে অপরকেও ভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বানকারী। এদের কোনো একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের নিকট হজরত ঈসা আ. এর নবুয়তের দাওয়াত উপস্থাপন করা হলে সে বলেছিলো 'আমরা পথপ্রাপ্ত দল। পথপ্রদর্শনকারীর প্রয়োজন আমাদের নেই'। কতো বড়ো মূর্খতা! কতো বড়ো দুর্ভাগ্য! যিনি মৃতকে জিন্দা করেন, জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় দান করেন, তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই ছিলো জ্ঞানীর কাজ। কারণ, ওই সকল মোজেজা তো অপ্রকৃত জ্ঞানকে মুহূর্তেই নিভিয়ে দিয়ে মূল জ্ঞানশিখার সংস্পর্শ এনে দেয়। না দেখে, না বুঝে, না চিন্তা করে নবুয়তের আহ্বানের অস্বীকৃতি পূর্ণ হিংসা এবং নিখাদ মূর্খতা। তাদের বিদ্যাবত্তার মূল শিরোনাম 'ফাল্‌সাফাহ্' (দর্শনশাস্ত্র)। ফাল্‌সাফার অধিকাংশ অক্ষর সাফাহ্ বা মূর্খতা। আল্লাহ্‌পাক এদের অপবিত্র বিশ্বাসের অন্ধকার থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।

শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর বর্ণনাসমূহের মধ্যেও ঔচিত্য এবং বাধ্যবাধকতার ইঙ্গিত আছে। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার 'কুদরত' বা ক্ষমতাগুণের অর্থ ও প্রয়োগের ব্যাপারে দার্শনিকদের মতের অনুকূল ধারণা রাখেন। দার্শনিকদের মতো তাঁরও মত এই যে, সক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজ না করা বৈধ নয়। বরং কাজ করা তার জন্য অত্যাবশ্যক (আর আল্লাহ্ যেহেতু ক্ষমতাবান তাই কাজ করতে বা সৃষ্টি করতে তিনি বাধ্য)– এরকম মত সত্যের প্রতিকূল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এরকম ভ্রান্ত মতামত ব্যক্ত করা সত্ত্বেও শায়েখ মহিউদ্দিন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট গ্রহণীয় ব্যক্তিগণের অন্তর্ভূত পরিলক্ষিত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ মতামত সত্যবাদী আলেমগণের বিরুদ্ধে। ইজতেহাদ বা মাসআলা উদ্ধারে ভুল হলেও যেমন মুজতাহিদ ব্যক্তি নিন্দিত বা তিরস্কৃত হন না, শায়েখ মুহিউদ্দিনের বিষয়টিও সেরকমই। তাঁর ভুল প্রকৃতপক্ষে কাশফের ভুল, যা ইজতেহাদী ভুলের মতো। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন 'শায়েখ মুহিউদ্দিনের প্রতি আমার খাস আকিদা এই যে, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে মকবুল। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কাশফ ভুল এবং সাধারণের জন্য ক্ষতিকর। সুফীগণের কোনো কোনো দল শায়েখকে নিন্দা-অপবাদ দেয় এবং তাঁর এলেমসমূহকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা করে। আবার কোনো কোনো দল শায়েখের আনুগত্য করে এবং তাঁর সমস্ত এলেমকে শুদ্ধ ও সত্য বলে বিশ্বাস রাখে এবং বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ দ্বারা শায়েখের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। এই উভয় দল সরল সত্য মধ্যবর্তী পথ থেকে সরে গিয়েছে। শায়েখ আল্লাহ্‌তায়ালার মকবুল ব্যক্তি। সুতরাং কীভাবে তাঁকে অস্বীকার করা যেতে পারে? আবার তাঁর এলেমসমূহের অধিকাংশই সত্যবাদী আলেমগণের মতের বিপরীত। সুতরাং কীভাবে সে সমস্তকে শুদ্ধ বলে

স্বীকার করা সম্ভব? অতএব বর্ণিত অভিমতদ্বয়ের মধ্যাবস্থাই সত্য। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অপার অনুগ্রহে একথা আমাকে অবগত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। অবশ্য 'ওয়াহ্দাতুল অজুদ' (তওহিদের একটি অপরিণত ও বিখ্যাত ধারণা) এর মাসআলার মধ্যে সূফীগণের এক বিরাট দল একমত। এই মাসআলাটি বাহ্যত সত্যবাদী আলেমগণের বিপরীত মনে হলেও চিন্তা ও গবেষণাসাপেক্ষে, সমন্বয় অথবা সমাধানযোগ্য। এ অধম ফকির (হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি) আমাদের হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর রুবাইয়াতের ব্যাখ্যায় এই মাসআলাটিকে সত্যবাদী আলেমগণের মতের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টির জটিলতা শব্দ বিভ্রাটের উপর স্থাপন করে উভয় দলের দ্বিধা-সন্দেহ এমনভাবে উৎপাটিত করেছেন যে, প্রতর্কপ্রশ্রয়তার অবকাশ আর নেই'।

১২ সৃজনশীলতা

সৃষ্ট পদার্থ যে রকমই হোকনা কেনো– আশ্রয়নিরপেক্ষ অথবা আশ্রয়সাপেক্ষ, শরীর অথবা প্রাণ, আকাশ অথবা ভূতচতুষ্টয় (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস)– সকল কিছুই সর্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময় আল্লাহ্তায়ালার সৃজনেচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণতই নির্ভরশীল। তিনিই সমগ্র সৃষ্টিকে অনস্তিত্বের অন্তরাল থেকে অস্তিত্বের দৃষ্টিগোচরতায় এনেছেন।অস্তিত্বপ্রাপ্তি এবং স্থায়িত্ব লাভ, সকল ব্যাপারেই সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। সকল সামগ্রী-সরঞ্জাম (যেমন মাতাপিতার মধ্যস্থতায় সন্তান লাভ, ঔষধের মধ্যস্থতায় রোগ নিরাময়, পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জন) তাঁর কাজের পর্দা এবং সকল বুদ্ধিকৌশল তাঁর কুদরতের আবরণ। তাও নয়। বরং উপকরণ-সামগ্রীকে তিনি তাঁর কাজের প্রমাণ এবং জ্ঞানবুদ্ধিকে তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন করেছেন।

সৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থিতি সম্পূর্ণতই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর ইচ্ছা এবং অনুগ্রহেই জগতের সকল নিয়মশৃঙ্খলা, আবর্তন-বিবর্তন-অনুবর্তন-পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। নতুবা জড় এবং অচেতন বস্তুপুঞ্জের সঞ্চালন, স্পন্দন আদৌ সম্ভব ছিলো না। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সহজেই বোঝেন যে, সৃষ্টির এই ভাঙাগড়া লীলারহস্যের পরিচালক, ব্যবস্থাপক এবং স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেউ আছেন। আর যারা নির্বোধ, তারা

সৃষ্টিকে স্বয়ং ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আপনাআপনি সৃষ্ট মনে করে। এভাবেই তারা প্রকৃত স্রষ্টাকে অস্বীকার করে এবং নাস্তিকতার ভ্রান্তিকে সত্য বলে মনে করতে থাকে।

আল্লাহ্তায়ালার এরশাদ–

'ইউদ্বিল্লুবিহী কাছীরাঁও ওয়া ইয়াহ্দী বিহী কাছীরা'– 'ইহা দ্বারা অনেকে পথচ্যুত হয়, আবার অনেকে হয় পথপ্রাপ্ত'। সুরা বাকারা, ২৬ আয়াত।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র. বলেন 'আমার এই মারেফাত নবুয়তের তাক থেকে গৃহীত। সবাই এই তত্ত্বটি বুঝতে সক্ষম নয়। একদল সুফী মনে করেন, সরঞ্জাম বা মধ্যস্থতা উঠে যাওয়াই কামালাত বা পূর্ণতা। তারা সকলকিছুকে বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সম্পর্কিত করেন। তারা জানেন না যে, সরঞ্জাম-মধ্যস্থতা উঠে যাওয়া মানে আল্লাহ্তায়ালার হেকমত বা কৌশল উঠে যাওয়া। অথচ হেকমতের ভিতরে বহু উপকার এবং কল্যাণ রয়েছে।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন–

'রব্বানা মা খলাক্তা হাজা বাতিলা'– হে আমাদের প্রতিপালক। এটা তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। আলে ইমরান, ১৯১ আয়াত।

নবী ও রসুলগণ সরঞ্জাম-মধ্যস্থতার প্রতি দৃষ্টি রেখে চলতেন এবং সকল কাজের ফলাফল আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ন্যস্ত করতেন। মানুষের কুদৃষ্টির আশংকায় হজরত ইয়াকুব আ. তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন 'বৎসগণ, তোমরা এক দরোজা দিয়ে (বাদশাহ্র দরবারে) প্রবেশ কোরো না। ভিন্ন ভিন্ন দরোজা দিয়ে প্রবেশ কোরো'। সূরা ইউসুফ, ৬৭ আয়াত।

এরকম উপদেশ দেওয়ার পর তিনি আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নির্ভরতা প্রকাশ করেছিলেন এভাবে– 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষের কোনোকিছু থেকে রক্ষা করতে পারবো না। আদেশ আল্লাহ্তায়ালার অধিকারভূত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করলাম এবং তাঁর উপরে নির্ভর করাই নির্ভরকারীগণের কর্তব্যকর্ম'।

আল্লাহ্তায়ালা নবী ইয়াকুব আ. এর এই মারেফাত এবং জ্ঞানকে পছন্দ করে বলেছেন 'নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞানবান, যেহেতু আমি তাঁকে জ্ঞান দান করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না'। সূরা ইউসুফ, ৬৮ আয়াত।

আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদুর রসুলুল্লহ্ স.কেও আল্লাহ্তায়ালা সরঞ্জাম-মধ্যস্থতার পাঠ দিয়েছেন এভাবে– 'হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ্তায়ালাই যথেষ্ট। তৎসহ আপনার আনুগত্যকারী মুমিনগণ'। সূরা আনফাল, ৬৪ আয়াত।

বস্তুসমূহ বা উপকরণ-সরঞ্জামাদির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (তাছির) ব্যাপারটা আবার অন্যরকম। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি সরঞ্জাম-সামগ্রীতে তাছির সৃষ্টি করেন তবে উদ্দেশ্য সফল হয়। আর যদি না করেন তবে হয় না। সাধারণভাবে তাছির অস্বীকার করা গোয়ার্তুমির নামান্তর। তাছির স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তাকেও বস্তুসামগ্রীর মতো আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টবস্তু বলে জানতে হবে। এই ফকিরের অভিমত এরকমই। আল্লাহ্‌পাক প্রকৃত বিষয়ের জ্ঞানদাতা'।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সামান-সরঞ্জামের মধ্যস্থতা গ্রহণ আল্লাহ্‌পাকের উপর তাওয়াক্কোলবিরোধী নয়। বরং এরকম আচরণ পূর্ণনির্ভরতার পরিচায়ক। যেমন, রোগে ঔষধের মধ্যস্থতা, যুদ্ধে অস্ত্রসম্ভারের, ক্ষুধায় খাদ্যের। অর্থোপার্জনে চাকুরী বা ব্যবসার মধ্যস্থতা গ্রহণও তাওয়াক্কোলের অনুকূলেই থাকে। প্রতিকূলে নয়। হজরত ইয়াকুব আ. মধ্যস্থতা অবলম্বন করেই তাঁর তাওয়াক্কোলকে প্রকাশ করেছিলেন এভাবে– 'তাঁরই প্রতি আমার নির্ভর এবং তাঁরই প্রতি নির্ভর করা নির্ভরকারীদের কর্তব্যকর্ম'। সূরা ইউসুফ, ৬৭ আয়াত।

১৩ সকল কাজের স্রষ্টা

আল্লাহ্‌তায়ালা ভালো মন্দ– সকল কাজের স্রষ্টা। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি ভালো কাজের সঙ্গে এবং অসন্তুষ্টি খারাপ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'ইচ্ছা' এবং 'সন্তুষ্টি'র মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। স্খলনমুক্ত দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত কেবল এই পার্থক্যের প্রতি জ্ঞান রাখে। অন্যান্য দল এই পার্থক্যের জ্ঞান না পাওয়ায় ভ্রষ্টতায় নিপতিত। যেমন মোতাজিলা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস– প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কাজের স্রষ্টা। আর কুকাজ এবং গোনাহ্‌র সৃষ্টিকর্তা মানুষই। শায়েখ মুহিউদ্দিন এবং তাঁর অনুগামীগণের বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় যে, ইমান এবং সৎকর্ম যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার 'আল হাদী' নামের পছন্দনীয় এবং কাম্য, তেমনি কুফর এবং গুনাহ্‌ও তাঁর 'আল মুদিল্লু' বা 'ভ্রষ্টকারী' নামের মনঃপুত এবং অভীপ্সিত। তাঁর এই বাক্যও সত্যবাদী আলেমগণের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি বাধ্যতা আরোপকারী। সূর্য যেমন কিরণ দিতে বাধ্য তার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির

এখানে কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু সূর্যের সৃষ্টিকর্তা তো সেরকম নন। বাধ্যতায় নয়, বরং স্ব-ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে সকল কাজ তিনিই সৃষ্টি করেন। তাঁর সন্তোষ উত্তম কাজের সঙ্গে। আর অসন্তোষ অনুত্তম কাজের সঙ্গে। একথা অবশ্যস্মরণীয়।

বান্দাদেরকে ইচ্ছা করবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যাতে তাদের অর্জন তাদের নিজেদের ইচ্ছার কারণে হয়। অতএব, ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম যে– 'সৃজন' আল্লাহ্‌তায়ালার দিক থেকে আর 'অর্জন' বান্দাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

আল্লাহ্‌তায়ালার ফিতরত বা আত্মভাব এরকম যে, বান্দারা কাজের ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌তায়ালার সৃজনশৈলী তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় এবং ঘটনা বা কাজে রূপ নেয়। বান্দার ইচ্ছাই যেহেতু কাজ সৃষ্টির সূচনা বা কারণ, তাই প্রশংসা অথবা তিরস্কার (সওয়াব অথবা গোনাহ্‌) তার প্রতিই বর্তায়। অনেকে বলেন, বান্দার 'এখতিয়ার' বা ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। আল্লাহ্‌তায়ালার এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তির তুলনায় দুর্বল একথা অবশ্য ঠিক, কিন্তু 'নির্দেশিত কাজ সম্পাদনে তার ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট নয়' একথা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা আয়ত্তাতীত বিষয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন না।

এরশাদ হয়েছে–

'বরং তিনি বান্দার প্রতি সহজ করতে চান। কঠিন করতে চান না'। সূরা বাকারা, ১৮৫ আয়াত।

পৃথিবীর সাময়িক কাজের বদলে চিরস্থায়ী বিনিময় প্রদান– আল্লাহ্‌তায়ালারই অনুগ্রহসিক্ত পরিমান নির্ধারণ। নির্ধারিত হয়েছে যে, সাময়িক কুফরের প্রতিফল চিরস্থায়ী আজাব এবং সাময়িক ইমানের বিনিময় চিরস্থায়ী বেহেশত।

আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ এরকম–

'এটা মহাপরাক্রমশালী ও সুকৌশলী আল্লাহ্‌তায়ালার পরিমাণ নির্ধারণ'। সূরা ইয়াসিন, ৩৮ আয়াত।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ায় আমরাও বুঝতে পারি যে, যিনি সকল প্রকার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ নেয়ামত দান করেছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা– সকল পূর্ণতা, পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর অস্তিত্বেই বিদ্যমান। এরকম পবিত্রতম সত্তার প্রতি অস্বীকৃতির প্রতিফল কঠিনতম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাই অস্বীকৃতির শাস্তি চিরকাল দোজখবাস। অপরপক্ষে শয়তান এবং প্রবৃত্তির প্রাধান্য সত্ত্বেও পবিত্রতম, মহোত্তম ও অদৃশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ইমান আনা এবং তাঁর প্রত্যাদেশকে সত্য জানার প্রতিদান সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াই শোভনীয়। অনন্ত বেহেশতবাস তাই তার পারিতোষিক নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন, বেহেশতলাভ আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একে ইমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, কর্মের প্রতিফল হিসাবে পারিতোষিক

প্রাপ্তির ধারণা অধিক আনন্দময়। এ ফকিরের ধারণা, বেহেশতলাভ প্রকৃতপক্ষে ইমানের প্রতিই নির্ভরশীল। আর ইমান আল্লাহ্তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। নিছক দয়া। পক্ষান্তরে দোজখভুক্তি কুফরের প্রতি ন্যস্ত এবং কুফর নফসে আম্মারা, অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তিজাত অপবিত্রতা।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন—

'উৎকৃষ্ট যা কিছু তুমি পাও তা আল্লাহ্র দিক থেকে। আর নিকৃষ্ট যা কিছু লাভ করো তা তোমারই প্রবৃত্তিজাত'। সূরা নিসা, ৭৯ আয়াত।

বেহেশতপ্রাপ্তি ইমানের কারণে জানা, প্রকৃতপক্ষে ইমানকে সম্মান করা, বরং যাঁর প্রতি ইমান আনা হয়েছে, তাঁরই সম্মান করা। এজন্যই চরমতম এবং উচ্চতম পারিতোষিক ইমানদার বান্দাকে দেওয়া হয়েছে। আবার দোজখভুক্তিকে কুফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা কুফরকে অপমান করা এবং একই সঙ্গে পবিত্রতম ও অতুলনীয় ওই সত্তার সম্মান করা, যাঁর প্রতি অবিশ্বাস করা হয়েছে। তাই চরমতম এবং নিকৃষ্টতম বিনিময় তার প্রতিদান।

১৪ আল্লাহ্তায়ালার দর্শন

মুমিনগণ পরকালে বেহেশতে আল্লাহ্তায়ালার দীদার লাভ করবেন। এই দীদার বা দর্শন সম্পর্কে আমরা যেরকম ধারণা রাখি, সেরকম নয়। আল্লাহ্পাকের দীদারের ক্ষেত্রে দিক, প্রকার, উদাহরণ— কোনোকিছুই কল্পনা করা যায় না। দূরত্ব-নৈকট্যের ধারণাও সেখানে অচল।

হাদিস শরীফে এসেছে, তোমরা অতিশীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালককে এমনভাবে দেখবে, যেমন ভাবে দেখো চতুর্দশীর চাঁদকে।

এই হাদিসের বর্ণনায় বোঝা যায়, দীদারের সম্পর্ক কেবল দেখার সঙ্গে। নতুবা চাঁদ কখনো আল্লাহ্পাকের জাতের তুলনা হতে পারে না। রসুলেপাক স. এর উক্ত হাদিসের প্রতি আমাদের আস্থা রাখতে হবে। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার সঠিক অবস্থা আমাদের জ্ঞানের আওতাভূত যে নয়, একথাও বুঝতে হবে।

দীদারের প্রতি ইমান রাখাই জরুরী। দীদারের রকম, প্রকার, অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ (যা অসম্ভব) করা জরুরী নয়।

পৃথিবীতে জাগ্রত অবস্থায় স্বচক্ষে আল্লাহ্তায়ালার দীদার সম্ভব নয়। কেবল মেরাজের রাতে রসুলেপাক স. আল্লাহ্পাককে দেখেছেন। কিন্তু সেই দীদার হয়েছিলো ঊর্ধ্বজগতে। পৃথিবীতে নয়।

হজরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেন, মুহাদ্দিসীন, ফিকাহবিদ, দার্শনিকবৃন্দ, এমনকি তরিকার মাশায়েখগণ এ বিষয়ে একমত যে, আউলিয়াগণের কেউই স্বচক্ষে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখতে পাননি। 'কিতাবে তাআ'রুফ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, মাশায়েখ বা বুজর্গবৃন্দের কেউই স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখার দাবী করেননি। কেউ এ বিষয়ে কোনো দলিল-প্রমাণও দেননি। কিন্তু মূর্খ সুফীদের একদল (আদতে তারা সুফীদের কাতারভুক্তও নয়) আল্লাহকে দেখার দাবী করে থাকে। বুজর্গানে দ্বীন এ বিষয়ে একমত যে, স্বচক্ষে আল্লাহ্ দর্শনের দাবীদার মিথ্যাবাদী এবং এরকম বাক্য মারেফত লাভ না হওয়ার চিহ্ন।

আল্লাহ্পাককে স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে অবশ্য মতভেদ পাওয়া যায়। কিন্তু একথা সত্য যে, স্বপ্নে আল্লাহ্র দীদার সম্ভব। পূর্ববর্তী বুজর্গগণ এ বিবরণটির প্রত্যয়ন করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহ্পাককে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করলাম 'হে আমার আল্লাহ! সর্বোত্তম ইবাদত কী এবং তোমার নৈকট্য অর্জনের নিকটতম উপায় কোনটি'? আল্লাহ্পাক জবাব দিলেন 'কোরআনুল করীমের তেলাওয়াত'।

ইমামে আজম র. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একশত বার স্বপ্নে আল্লাহ্তায়ালাকে দেখেছেন। ইবনে সিরীন র. বলেন, স্বপ্নে আল্লাহ্পাককে দর্শনকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে।

শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেন 'এরকম স্বপ্নদর্শন আসলে অন্তরের দর্শন। প্রকাশ্য চক্ষু তাঁকে দেখতে অক্ষম। যদি কেউ প্রকাশ্য চোখে আল্লাহ্কে দেখে, তবে সে দর্শন হবে মেছাল। আল্লাহ্ মেছ্লী নন। কিন্তু মেছালী। মেছেল বলা হয় সম্পূর্ণ গুণাবলীর দিক দিয়ে যার সাথে তুলনা করা হয়, তার সমকক্ষ হওয়াকে। কিন্তু মেছালের মধ্যে গুণাবলীর সমতা আবশ্যকীয় নয়। যেমন আকল বা জ্ঞানকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়। অথচ জ্ঞানের সঙ্গে সূর্যের সামগ্রিক সাদৃশ্য নেই। উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু এতোটুকু— সূর্যের আলোয় যেমন বস্তুসমুদয় স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, জ্ঞানের আলোকেও তেমনি সুন্দর-অসুন্দর ভালো-মন্দের পার্থক্যরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেছাল হওয়ার জন্য এরকম ক্ষীণ কোনো সম্পর্ক থাকাই যথেষ্ট। এ কারণেই বাদশাহ্কে সূর্য এবং মন্ত্রীকে চন্দ্রের সঙ্গে

উপমা দেয়া হয়। স্বপ্নে সূর্যদর্শনের ব্যাখ্যা এই যে– রাজদর্শন ঘটবে। আর চন্দ্রদর্শনের ব্যাখ্যা– ঘটবে মন্ত্রীদর্শন।

মেছালকে কোরআন মজীদে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে–

‘আল্লাহ্‌র নূরের উপমা ওই নূরের মতো, যার মধ্যে থাকে প্রদীপ এবং প্রদীপটি শিশার ফানুসের মধ্যে আলো বিকিরণ করতে থাকে’। সূরা নূর।

আল্লাহ্‌পাকের অতুলনীয় জাত বা সত্তা প্রদীপ, শিশা ও ফানুসের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। তিনি এসবের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র ও মুক্ত। জয়তুন গাছের সঙ্গেও তিনি তুলনীয় নন। অবশ্যই নন। বরং এখানকার দৃষ্টান্ত ওই ধরনের, যেমন কোরআন মজীদকে তুলনা করা হয়েছে ‘হাবলুম মানাতিনে’র (একটি আলোকরশ্মির) সঙ্গে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি রশ্মি কোরআনের সামগ্রিক সাদৃশ্য নয়’।

ফেরেশতাবৃন্দ এবং রমণীকুলও আখেরাতে আল্লাহ্‌পাকের দীদার লাভ করবেন। তবে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মুমিনদের মতোই সংখ্যাগত এবং অবস্থাগত পার্থক্য তো থাকবেই।

জ্বিন সম্প্রদায় আল্লাহ্‌তায়ালার দীদার পাবে না। এ সম্পর্কে শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেন ‘জ্বিনদের আল্লাহ্‌দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকার কথাটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কেননা, ইমামে আজম আবু হানিফা র. এবং অন্যান্য ইমামগণের এক দল এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জ্বিনেরা তাদের নেক আমলের সওয়াব পাবে না। বেহেশতেও তারা প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের সৎ কাজের প্রতিদান হবে এই যে, তারা দোজখের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাবে।

তিনি আরো বলেন ‘কাফের এবং মুনাফিকেরাও কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌কে কঠোর এবং প্রচণ্ড রোষান্বিত অবস্থায় দেখবে। এরপর চিরদিনের জন্য সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাবে, যাতে তাদের আক্ষেপ এবং আজাব ক্রমাগত প্রচণ্ডতর হতে থাকে’।

১৫ নবী ও রসুল প্রসঙ্গ

নবী ও রসুল প্রেরণ পৃথিবীবাসীদের জন্য রহমত বা দয়া। তাঁদের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্‌তায়ালার জাত সিফাতের জ্ঞানলাভ ছিলো অসম্ভব। আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়াবলীতো তাঁদের মাধ্যমেই পার্থক্য লাভ করেছে। তাঁদের দাওয়াতী নূরের সাহায্য ছাড়া আমাদের প্রজ্ঞা ও মনীষা অপূর্ণ ও অপদস্থ। জ্ঞান দলিল বটে, কিন্তু পূর্ণ দলিল নয়। পয়গম্বর প্রেরণই পূর্ণ দলিল, যার প্রতি আখেরাতের সওয়াব ও আজাব নির্ভর করে।

তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ ওহী (প্রত্যাদেশ) সত্য। ওহীর মাধ্যমে শরিয়ত প্রতিপালনের যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা-ও আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত। শরিয়ত অস্বীকারকারী বেদ্বীন কাফেরেরা বলে, এ কেমন ধরনের রহমত যে, মানুষকে নামাজ রোজা ইত্যাকার কষ্টকর কাজের আদেশ দিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের জন্য রহমত। শরিয়তের আদেশ-নিষেধসমূহ পালন করলে বেহেশত, আর না করলে দোজখ। এসব তো বন্দীত্ব। স্বাধীনতা নয়। –এ ধরনের কথা যারা বলে, তারা প্রকৃতই নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞ। তারা একথা জানে না যে, যিনি আমাদেরকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অসংখ্য নেয়ামত দানে ধন্য করেছেন, সেই নেয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের উপরে ওয়াজিব (অবশ্যকর্তব্য)। আর শরিয়তের দায়িত্বাবলী তো সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপকরণ মাত্র। অতএব, জ্ঞানতঃ শরিয়তের দায়িত্ব সম্পাদন করা অপরিহার্য। আবার পৃথিবীর শৃঙ্খলা রক্ষাও এই দায়িত্বপালনের উপর নির্ভরশীল। শরিয়তের শাসন না থাকলে দুষ্টামী, নষ্টামী ও বিশৃঙ্খলায় পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যেতো। প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি অপরের সম্পদের প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ করতো। এভাবে সূত্রপাত হতো শত সহস্র বিপর্যয়ের। এভাবে অত্যাচারীরা অপরকে ধ্বংস করতো। নিজেরাও ধ্বংস হতো। পৃথিবীর শৃঙ্খলা ও শান্তি শরিয়তের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন–

‘এবং প্রতিশোধ বাস্তবায়নের মধ্যেই তোমাদের জীবন রয়েছে, ওহে বিবেচক ব্যক্তিগণ’। সূরা বাকারা ১৭৯ আয়াত।

আল্লাহ্‌পাক সকল কিছুর মালিক। বান্দাগণ তাঁর পূর্ণ দাস। তিনি আপন দাসদের প্রতি যে আচরণই করেন, অথবা যে আদেশই প্রদান করেন– তা অবশ্যই বান্দাদের জন্য কল্যাণকর ও সংশোধনসূচক বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন–

‘তিনি যা করেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবার কেউ নেই’। সূরা রা’দ ৪১ আয়াত।

তাঁর পরাক্রম দেখে সাধ্য আছে কার
সমর্পণ ছাড়া কথা বলবে আবার।

আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র সৃষ্টিকে চিরদিনের জন্য দোজখে স্থাপন করলেও প্রতিবাদের অবকাশ নেই। এতে অত্যাচারের সন্দেহও অবান্তর। আমাদের অধিকার এর বিপরীত। বরং আমাদেরকে অধিকার তো দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালাই। অতএব, চিন্তা-চেতনায়, বক্তব্যে, আচরণে ও কর্মে ওই পর্যন্ত অগ্রসর হওয়াই আমাদের জন্য সঙ্গত, যে পর্যন্ত প্রকৃত মালিক আমাদের জন্য বৈধ বা মোবাহ সাব্যস্ত করেছেন।

নবী-রসুলগণ মাসুম (নিষ্পাপ)। তাঁদের দ্বারা ভুল সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু ভুলের উপরে স্থায়ী থাকা তাঁদের পক্ষে সঙ্গত নয়। আর ভুল কিন্তু গোনাহ্ নয়। গোনাহ্ তাদের দ্বারা সংঘটিত হতেই পারে না। আবুল আলা মওদুদীর মতো মোরতাদ ব্যক্তিরা ভুলকে গোনাহ্ মনে করে সম্মানিত, পবিত্র ও নিস্পাপ নবী রসুলগণকে দোষী সাব্যস্ত করে। আল্লাহ্পাক ওই সকল বেদ্বীন ব্যক্তিদের অপবিত্র বিশ্বাস থেকে সকল ইমানদারকে নিরাপদ রাখুন। আমিন।

আল্লাহ্তায়ালা নবী-রসুলগণকে মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনা দ্বারা সাহায্য করেছেন। মোজেজা সত্য। মোজেজা দ্বারা ইমান লাভ হয়। মোজেজা নবুয়তের সত্যতার অটল প্রমাণ।

নবী ব্যতীত অন্য কেউ মোজেজা প্রকাশ করতে পারে না। আল্লাহ্পাকের নিয়ম এই যে, তিনি কারণ ছাড়া সাধারণত কোনোকিছু সৃষ্টি করেন না। এটা তাঁর কানুন (বিধান)। কিন্তু কোনো কোনো সময় তিনি তাঁর কানুনকে ভেঙে তাঁর অপার কুদরতের প্রকাশ ঘটান। কোনো প্রকাশ্য কারণ ছাড়াই নবী-রসুলের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা সৃষ্টি করে দেন। মোজেজা আসলে আল্লাহ্তায়ালারই কাজ, যদিও তা নবী-রসুলগণের মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ, আল্লাহ্তায়ালার কানুন ভেঙে ফেলার ক্ষমতা রয়েছে কেবল আল্লাহ্রই। নবুয়তের দাবী একটি অসাধারণ দাবী। তাই অসাধারণ ঘটনা (মোজেজা) তার প্রমাণ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। মোজেজা আল্লাহতায়ালার কুদরত। মোজেজা প্রকাশিত হওয়া মানে ইমানের সম্পূর্ণ কানন উন্মোচিত হওয়া। ইমানের অক্ষয় কাননের চিরসুবাসিত আশ্রয় থেকে এর পরেও যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা সত্যিই সত্তাগতভাবে দুর্ভাগ্যশীল।

হজরত মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী ও রসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। একথা যারা বিশ্বাস করে না, তারা নিঃসন্দেহে কাফের। যেমন কাদিয়ানি সম্প্রদায়।

রসুলে আকরম মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা স. আল্লাহ্তায়ালার মাহবুব (প্রেমাস্পদ)। তিনি জ্বিন, ইনসান, ফেরেশতা– সকলের নবী। নবীগণেরও নবী। আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন নূরে মোহাম্মদী স.। প্রথম নবী হজরত আদম আ. যখন সৃষ্ট হননি, তখনও তিনি নবী ছিলেন। প্রকৃত ইমানদার ওই ব্যক্তি, যিনি তাঁর সকল প্রিয় বস্তু, এমনকি নিজের জীবন অপেক্ষা রসুলেপাক স.কে বেশী ভালোবাসেন। কিন্তু বাতিল ও বেআদব ওহাবী সম্প্রদায় ভালোবাসার বদলে রসুলে করিম স. এর প্রতি পোষণ করে শত্রুতা। এদের জঘন্য ও ঘৃণ্য আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে শামী, আশ শিহাবুছ ছক্বিব, বাহারে শরিয়ত ইত্যাদি পুস্তকে পরিষ্কার বর্ণনা করা আছে। 'আমার হাতের লাঠি মোহাম্মদ অপেক্ষা অধিক উপকারী' এরকম কথা কেবল ওহাবী শয়তানদের অপবিত্র মুখেই উচ্চারিত হওয়া সম্ভব।

১৬ কবরের শাস্তি

কবর আজাব সত্য। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কবর আজাব বিশ্বাস করা জরুরী। কবর মানে আলমে বরজখ (দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী জগত)। কবর আজাব হবে কাফেরদের জন্য এবং গোনাহ্গার মুমিনদের জন্য। নেককার মুমিনদের জন্য নয়।

মুনকির ও নকীর দুজন ফেরেশতা। তাঁরা ভয়ংকর, কালো রঙের এবং নীল চক্ষুবিশিষ্ট। তাঁরা সদ্যমৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দিতে পারেন যাঁরা, তাঁদের কবরকে বেহেশতী বাগিচা বানিয়ে দেওয়া হয়। আর জবাব সঠিক না হলে কবর হয় দোজখের গর্তের মতো আজাবে পরিপূর্ণ।

শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেন ‘এ বিষয়ে কোরআনের আয়াত এবং হাদিসসমূহ সোচ্চার। সুতরাং এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। কবর আজাবের প্রকৃত অবস্থাসমূহকে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর ন্যস্ত করে ক্ষান্ত থাকা উচিত। ওই অবস্থা আলমে বরজখ সম্পর্কীয় হোক কিংবা আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কীয়। ওই সকল অবস্থাকে মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালা যেভাবে চান, সেভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ইমান। আসল কথা হলো, মেনে নেয়ার নামই ইমান। অনুধাবন করবার চেষ্টাতো ভিন্ন ব্যাপার। আহলে সুন্নতের রীতি এটাই।

নবী রসুলগণ কবরের প্রশ্নোত্তর পর্বের বাইরে। এটা নবী রসুলগণের সম্মান ও মর্যাদা। তাঁদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তবে তা হবে তওহীদের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন। জ্বিনদেরকেও কবরে প্রশ্ন করা হবে। জবাবদানে অক্ষম জ্বিনকে কবর আজাব ভোগ করতে হবে।

কাফেরদেরকে বিনা প্রশ্নেই শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু মুনাফিকদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী র. বলেন ‘কতিপয় হাদিসের ভাষ্যকার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ্‌পাকের রাস্তায় জীবনপাতকারী শহীদ, জুমআর রাতে মৃত্যুবরণকারী, প্রতিরাতে সুরা মূলক তেলাওয়াতকারী এবং কলেরায় মৃত্যুবরণকারীদেরকে কবর আজাব থেকে রেহাই দেওয়া হবে’।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন ‘ ওই ব্যক্তি ভাগ্যবান, যাঁর ভুলত্রুটিসমূহ আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর পূর্ণ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন এবং মোটেই শাসন না করেন। যদিও শাসন করেন, তবে পূর্ণ দয়ায় পার্থিব কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করে দেন। তারপরও গোনাহ্ থাকলে কবরের সংকীর্ণতা ও আজাব দ্বারা ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে পাক-পবিত্র অবস্থায় হাশরের ময়দানে উত্থিত করাবেন। এরকম না করে তার শাসন যদি আখেরাতের জন্য স্থগিত রেখে দেন, তবুও তা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য একান্ত সুবিচার হবে। কিন্তু ওই ধরনের পাপীদের জন্য নিতান্ত আক্ষেপ ও সর্বনাশ। অবশ্য উক্ত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, তবে একসময় আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমা ও রহমতপ্রাপ্ত হবে এবং চিরস্থায়ী আজাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এটাও অতি উচ্চ নেয়ামত। হে আমাদের প্রভুপালক! রসুলগণের নেতা স. এর অসিলায় আমাদের জন্য নির্ধারিত নূর পূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান’।

১৭ বিচারের দিবস

রোজে কিয়ামত বা বিচারের দিবস সত্য। সেদিন আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, ভূমণ্ডল, পর্বত, সমুদ্র, প্রাণীকুল, উদ্ভিদকুল– সবই ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাবে। আকাশ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, নক্ষত্রমণ্ডলী হয়ে পড়বে বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল। পৃথিবী, পর্বতরাজি উড়তে থাকবে ধূলিকণার মতো। ইস্রাফিল আ. এর শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে শুরু হবে ওই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা। দ্বিতীয় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ কবর থেকে উত্থিত হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হতে থাকবে।

দার্শনিকেরা এবং পদার্থবিদেরা আকাশ, ভূমণ্ডল এবং নক্ষত্রমণ্ডল ধ্বংস হবে না বলে থাকে। তারা সৃষ্টিকে অনাদি, অনন্ত বলে জানে (‘বস্তুর অবিনাশিতাবাদ’ এরকমেরই মতবাদ)। এই মতে আস্থা স্থাপনকারীরা কোরআনের নিশ্চিত বাণী এবং প্রকাশ্য হুকুম অস্বীকারকারী এবং পয়গম্বর আ.গণের এজমা (ঐকমত্য) অমান্যকারী।

আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন ‘যখন সূর্য চাদরবেষ্টিত হবে অর্থাৎ আলোকশূন্য হবে এবং যখন নক্ষত্ররাজি হবে কৃষ্ণকায়’ (সূরা তাকভীর) ‘যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং আপন প্রতিপালকের আদেশ মেনে নিবে এবং তার কর্তব্যকর্ম সেটাই’ (সূরা ইনশিকাক) ‘এবং আসমানসমূহ উন্মুক্ত হয়ে অসংখ্য দরোজায় পরিণত হবে’ অর্থাৎ বিচূর্ণ হবে (সূরা নাবা)। কোরআন মজীদে এরকম অনেক আয়াত রয়েছে।

ইমাম আহমদ র. এবং ইমাম মুসলিম র. বর্ণিত হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি প্রতিশোধ নিবে। শিঙবিহীন ছাগল ওই ছাগল থেকে প্রতিশোধ নিবে, যে তাকে পৃথিবীতে শিঙ দিয়ে অযথা আঘাত করেছিলো। এভাবে প্রতিটি প্রাণী-পিপীলিকাও তাদের প্রতিশোধের পাওনা আদায় করে নিবে। প্রতিশোধের পালা শেষে প্রাণীজগতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া

হবে। যে সকল প্রাণী মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, সেগুলোকে পরিণত করে দেয়া হবে উর্বর মৃত্তিকায়।

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেন ‘কেবল শিঙ্গার ফুৎকারকেও কিয়ামত বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, মৃত্যুর পর থেকে বেহেশত বা দোজখে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত সময়টাই কিয়ামত। গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অনুধাবন করা যাবে, প্রতিদিনই মানুষের জীবনে এরকম অবস্থা অতিবাহিত হয়। হাদিস শরীফে আছে, প্রদোষকালে মানুষের অন্তর বিষণ্ন ও সন্ত্রস্ত হয়। পাখি ও প্রাণীকুল নিজ আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ে। এটা এক ধরনের মৃত্যুই। এটা প্রথম শিঙ্গা ফুৎকারের একটা অতি দূরবর্তী নিদর্শন। ঘুম থেকে জেগে প্রাণীকুল আবার ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দিকে। এটা দ্বিতীয় ফুৎকারের ন্যূনতম নমুনা’।

১৮ মীযান

পরকালের হিসাব এবং মীযান (তুলাদণ্ড) সত্য। মীযানের মাধ্যমে মানুষের পুণ্য ও পাপের ওজন করা হবে। পুণ্যের পাল্লা ভারী হলে বেহেশত। পাপের পাল্লা ভারী হলে দোজখ। সত্য সংবাদদাতা হজরত নবীয়ে করিম স. এই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। নবুয়তের রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই বিষয়ে সন্দিগ্ধ। তাদের দ্বিধা ধর্তব্য নয়। তারা তাদের প্রজ্ঞা দিয়ে সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু নবুয়তের পদ্ধতি প্রজ্ঞার সীমানাবহির্ভূত। প্রজ্ঞা দিয়ে নবুয়তের রীতিনীতি বুঝতে চেষ্টা করা নবুয়ত অস্বীকারের নামান্তর। তারা জানে না যে, জ্ঞানের রীতিকে নবুয়তের রীতির অনুসারী করাই প্রকৃত কর্তব্যকর্ম।

১৯ পুলসিরাত

পুলসিরাত সত্য। কিয়ামতের সময় আল্লাহ্পাক দোজখের উপর একটি সেতু তৈরী করবেন। সেতুটি হবে চুলের চেয়ে চিকন এবং তলোয়ারের চেয়েও ধারালো। পুলসিরাত পার হবার জন্য সবাইকে হুকুম দেওয়া হবে। খাঁটি ইমানদারেরা অতি সহজে সেতু পার হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কেউ পার হবেন বিদ্যুতের গতিতে, কেউ প্রবহমান বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে। মর্যাদার তারতম্য অনুযায়ী এই গতির তারতম্য ঘটবে। এই দুনিয়াতে ধর্ম এবং ন্যায়-বিচারকে পুলসিরাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

দোজখীরা পার হতে পারবে না। তাদের পা কেঁপে উঠবে এবং তারা দোজখে পড়ে যাবে।

পুলসিরাতের উপর দিয়ে প্রত্যেককে পার হতে হবে। সকল নবী, রসুল এবং স্বয়ং রসুলে আকরম স.ও পুলসিরাত অতিক্রম করবেন। তাঁর এই সেতু অতিক্রম প্রকৃতপক্ষে গোনাহ্গার উম্মতের জন্য দয়া ও সহানুভূতি।

এক বর্ণনায় হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন ‘রসুলে আকরম স. এই হুকুম থেকে পৃথক। তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং সমস্ত উম্মতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন’।

একজন সাধারণ মুমিনকে লক্ষ্য করেও আগুন ফরিয়াদ করতে থাকবে ‘ হে মুমিন! দ্রুত চলে যাও। তোমার ইমানের নূর যে আমার জ্বলন্ত শিখাকে নিবু নিবু করে ফেলছে’। একজন সাধারণ মুমিনের অবস্থা যদি এরকম হয়, তবে রসুলে আকরম স. এর অবস্থা কী রকম হবে, তা অনুমান করাও শক্ত। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্পাকই জানেন।

২০ শাফায়াত

হাদিস শরীফে এসেছে 'আমার শাফায়াত আমার উম্মতের বড় বড় পাপীদের জন্য'। আরও এরশাদ হয়েছে 'আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। পরকালে তাদের কোনো শাস্তি নেই'।

শাফায়াতের (সুপারিশের) দরোজা প্রথম উন্মুক্ত করবেন রসুলে আকরম স.। আর এর ফলে তিনি আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তা সুস্পষ্ট হয়ে পড়বে। হাশরের ময়দানের আতঙ্কিত ও অস্থির জনতা সুপারিশের আবেদন নিয়ে প্রথমে যাবে হজরত আদম আ. এর কাছে। বলবে, আপনি মানব সম্প্রদায়ের পিতা। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। বেহেশতে স্থান দিয়েছেন। ফেরেশতারা আপনাকে সেজদা করে সম্মানিত করেছে। সকল জিনিসের নাম আপনার জানা। এই কঠিন দিনে আপনি আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। হজরত আদম আ. বলবেন 'রব্বুল আলামীনের কাছে কিছু বলা আমার শক্তির বাইরে। নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে যাওয়া এবং গন্দম খাওয়ার ব্যাপারে এখনও আমি লজ্জিত। তোমাদের কাজ হয়তো নূহের দ্বারা হতে পারে'।

হজরত নূহ আ.ও অপারগতা প্রকাশ করবেন। এভাবে অপারগতা প্রকাশ করবেন হজরত ইব্রাহিম আ. হজরত মুসা আ. হজরত ইসা আ.– সবাই। এরপর সবাই একত্রিত হবেন রসুলে আকরম স. এর নিকটে। তিনি উঠবেন এবং প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে সুপারিশের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হবেন। হুকুম হবে, মাথা ওঠান। আপনি যা কিছু চান, সবই পূর্ণ করা হবে। যা কিছু দাবী জানাবেন, মেনে নেয়া হবে'।

রসুলে আকরম স. সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে গোনাহ্‌গারদের মাগফিরাতের সুপারিশ করবেন। পুনরায় সেজদায় পড়ে দ্বিতীয় প্রকার পাপীদের জন্য শাফায়াত করবেন। এরপর তৃতীয়বারে সেজদা থেকে মাথা ওঠাবেন তখন, যখন সকল প্রকার গোনাহ্‌গারকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তখন কোরআনপাকে উল্লেখিত আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কাফের-মুশরিক-মুনাফিক ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

কোরআনপাকে এরশাদ হয়েছে, হে আমার মাহবুব! হে আমার খাস বান্দা! আমি আপনাকে এতো বিপুল নেয়ামত দান করবো, এতো অসংখ্য রহমত বখশিষ করবো যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আপনার কোনো আশা অপূর্ণ থাকবে না। হে মোহাম্মদ! সবাই আমার সন্তুষ্টির তালাশ করে, আর আমি আপনার সন্তুষ্টির অভিলাষী। সূরা দুহা।

নবী পাক স. বলবেন 'একজন উম্মতও বিনা ক্ষমায় থাকা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না'। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই– দয়ার অসীম সমুদ্র আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতই গোনাহ্‌গারদের আসল আশা-ভরসা। যেমন তিনি রব্বুল আলামীন (বিশ্বসমূহের প্রতিপালক), তেমনি তাঁর হাবীব রহমাতুল্লিল আ'লামীন (বিশ্বসমূহের রহমত)।

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেন 'তুমি তাঁর প্রকৃত উম্মত হও। তাঁর কাছে পূর্ণসমর্পিত হও। সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। অসুবিধা যদি দ্যাখো তবে বুঝবে, এখনো তাঁর সঙ্গে তোমার পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। সম্পর্ক অটুট হলে কোনো অসুবিধাই থাকবে না। অসংখ্য গোনাহ্ ইমানের নিকট কিছুই নয়। ইমানের নূর গোনাহ্‌র অন্ধকারে ঢাকা পড়ে না। যার ইমানী চিন্তা আছে, তার অন্য কোনো চিন্তা নেই'। হজরত সুফিয়ান সওরী র.কে সারা রাত্রি জেগে থাকতে দেখা যেতো। মানুষেরা বলতো 'কাঁদেন কেনো? প্রফুল্লচিত্ত থাকুন'। তিনি জবাব দিতেন 'গোনাহ্ যদি পর্বত পরিমাণও হয়, তবুও আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের সামনে তা অস্তিত্বহীন। আমিতো এজন্য কাঁদি যে, সঠিক ইমান নিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করতে পারবো কিনা'।

রসুলে আকরম স. কিয়ামত সম্পর্কে যা কিছু বিবরণ দিয়েছেন, তার সবকিছুকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। যেমন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, তওবার দরোজা বন্ধ হয়ে যাওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব, হজরত ইসা আ. এর আকাশ থেকে অবতরণ, ইমাম মেহেদী আ. এর আবির্ভাব ইত্যাদি। তাঁর জানিয়ে দেওয়া সকল হুকুম এবং সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

২১ বেহেশত ও দোজখ

বেহেশত এবং দোজখ বর্তমান আছে। কিয়ামতের হিসাব শেষে একদলকে বেহেশতে এবং একদলকে দোজখে প্রবেশ করানো হবে। এদের পারিতোষিক এবং শাস্তি চিরস্থায়ী।

'ফুছুছুল হেকাম' রচয়িতা বলেছেন, সকলের শেষফল হবে রহমত। আল্লাহ্‌পাক যেহেতু এরশাদ করেছেন 'এবং আমার রহমত সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে'। তিনি তাই বলেন, কাফেরদের তিন হোকবা দোজখের আজাব হবে। তারপর আগুন তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিলো নবী ইব্রাহিম আ. এর জন্য। ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা তাঁর মতে বৈধ। তিনি আরো বলেন, আধ্যাত্মিক পথের পথিকেরা কেউই কাফেরদের চিরস্থায়ী আজাবের কথা স্বীকার করেননি।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন, শায়েখ এই বিষয়ে সত্য থেকে দূরবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি একথা বুঝতে পারেননি যে, কাফের এবং মুমিনের একত্রে রহমতবেষ্টিত থাকা এই পৃথিবীর জন্য বিশিষ্ট। পরকালে কাফেরেরা রহমতের গন্ধও পাবে না।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন–

'নিশ্চিত অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের ব্যাপারে কাফেরগণ ব্যতীত আর কেউ নিরাশ হবে না'। সূরা ইউসুফ, ৮৭ আয়াত।

আল্লাহ্‌পাক আরো এরশাদ করেন–

'আমার রহমত সকল কিছুকে ঘিরে আছে। অতিসত্বর তা আমি ওই সকল ব্যক্তির জন্য লিখছি, যারা পরহেজগারী করে এবং জাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতসমূহের উপরে ইমান আনে'। সূরা আ'রাফ, ১৫৬ আয়াত।

শায়েখ প্রথম আয়াতের প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছেন। আয়াতের পরবর্তী অংশের প্রতি দৃষ্টি দেননি।

আল্লাহ্‌পাক আরো এরশাদ করেন–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌পাকের রহমত নেককারগণের নিকটবর্তী'। সূরা আ'রাফ, ৫৬ আয়াত।

আরো এরশাদ করেছেন–

'নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালাকে তাঁর রসুলগণের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মনে কোরো না'। সূরা ইব্রাহিম ৪৭ আয়াত। – এই আয়াতটি কেবল প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ইঙ্গিত নয়। এর মধ্যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও ভীতি প্রদর্শন উভয় কথাই আছে। অর্থাৎ রসুলগণের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা এবং কাফেরদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন। এই আয়াত দ্বারা প্রতিজ্ঞা এবং ভীতিপ্রদর্শন উভয় প্রকার অঙ্গীকার নিবারিত হয়েছে। সুতরাং এই আয়াত শায়েখের অনুকূল দলিল নয়। বরং প্রতিকূল প্রমাণ। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অর্থ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়া– পবিত্রাতিপবিত্র জাতের জন্য যা মোটেও শোভনীয় নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা আগেই জানেন যে, তিনি চিরদিন কাফেরদেরকে আজাব

দিবেন না। অথচ তার বিপরীত কথা বলে ভয় দেখিয়েছেন– এরকম কথা বিশ্বাস করা জঘন্য এবং নিন্দনীয়।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন–

'তোমার প্রভুপালক সম্মান ও পরাক্রমশালী প্রভুপালক। তারা যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র'। সূরা সাফ্‌ফাত, ১৮০ আয়াত।

'কাফেরদের চিরস্থায়ী আজাব হবে না'– এই ধারণা শায়েখের ভুল কাশ্‌ফজাত। কাশফে এরকম অনেক ভুলই হয়ে থাকে। এরকম ভুল কাশ্‌ফ দ্বারা অকাট্য বিশ্বাস অপসারণ করা যায় না।

২২ ফেরেশতা

ফেরেশতাবৃন্দ আল্লাহ্‌তায়ালার দাস। তাঁরা ভুলভ্রান্তি এবং গোনাহ্‌ থেকে সুরক্ষিত ও পবিত্র। আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ তাঁরা যথাযথভাবে পালন করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ এরকম–

'এবং যাহাই আদিষ্ট হয়, তাহাই করে' সূরা তাহরীম, ৬ আয়াত।

ফেরেশতাদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না। তারা না নারী। না পুরুষ। কোনো কোনো ফেরেশতাকে আল্লাহ্‌পাক রেসালত বা সংবাদ বহনের জন্য নির্বাচন করেছেন, যেমন মানুষের মধ্যেও রসুল বা বাণীবাহক আছেন।

আল্লাহ্‌পাকের এরশাদ–

'আল্লাহ্‌ ফেরেশতা এবং মানুষের মধ্য থেকে রসুল নির্বাচন করে থাকেন'। সূরা হজ, ৭৫ আয়াত।

সত্যবাদী আলেমগণের অধিকাংশের মত এই যে, বিশিষ্ট মানুষ বিশিষ্ট ফেরেশতা থেকে শ্রেষ্ঠ। তবে ইমাম গাজ্জালী র. ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালেক র. এবং 'ফুতুহাতে মক্কিয়া' রচয়িতা শায়েখ মুহিউদ্দিন আরাবী র. 'বিশিষ্ট ফেরেশতাকে বিশিষ্ট মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ' বলে মত প্রকাশ করেছেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন ‘ এই ফকিরের প্রতি যা উদ্‌ভাসিত হয়েছে তা এই– ফেরেশতাগণের বেলায়েত বা নৈকট্য নবী আ.গণের বেলায়েত থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নবুয়ত এবং রেসালতের মধ্যে নবী-রসুলগণের এমন এক মর্যাদা আছে, যা ফেরেশতাগণের কোনোদিনই লাভ হবার নয়। এই মর্যাদা মাটির কারণে হয়েছে, যে মাটি ফেরেশতাদের মধ্যে নেই। এ প্রসঙ্গে এই ফকিরের নিকট আরো প্রকাশ পেয়েছে যে, কামালতে নবুয়তের (সংবাদ প্রেরণ সম্পর্কিত পূর্ণতার) তুলনায় কামালতে বেলায়েতের (নৈকট্যসম্ভূত পূর্ণতার) কোনোই মূল্য নেই। আক্ষেপ! যদি মহাসাগরের তুলনায় একবিন্দু পানির অস্তিত্বতুল্যও হতো! অতএব বুঝতে হবে, বেলায়েতজাত উৎকর্ষ অপেক্ষা নবুয়তজাত উৎকর্ষ বহুগুণ বেশী। তাই, একথা নিশ্চিত যে, নবী-রসুলগণই সাধারণ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। ফেরেশতাগণের শ্রেষ্ঠত্ব আংশিক। কাজেই সত্যবাদী অধিকাংশ আলেমগণ যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। আল্লাহ্‌পাক তাঁদের প্রচেষ্টা সফল করুন। আমিন। এই আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে, কোনো ওলি কখনো নবীর স্তরে উপনীত হতে পারেন না। সর্বাবস্থায় ওলির মস্তক নবীর পদতলে।

জানা আবশ্যক যে, কোনো মাসআলার ব্যাপারে আলেম ও সুফী সমাজের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিলে আমি দেখি, আলেমগণের পক্ষই অধিক সত্য। এর রহস্য এই যে, পয়গম্বর আ. এর অনুসরণের কারণে তাঁদের লক্ষ্য কামালতে নবুয়তের এলেমের (ওহীজাত এলেমের) প্রতি স্থিরনিবদ্ধ থাকে। আর সুফীগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে কামালতে বেলায়েতজাত মারেফাতের দিকে। তাই বেলায়েত থেকে গৃহীত এলেম অপেক্ষা নবুয়তের তাক থেকে গৃহীত এলেম অধিকতর স্পষ্ট ও সঠিক হয়।

ফেরেশতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা চার জন। ১. হজরত জিবরাইল আ. – ইনি রসুলগণের নিকট ওহী বা প্রত্যাদেশ বহন করে নিয়ে আসেন। ২. হজরত মীকাইল আ.– এঁর উপর সমস্ত সৃষ্টজীবের জীবিকা পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জীবিকার বণ্টন-বিভক্তি ও পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত। ৩. হজরত ইস্রাফিল আ.–ইনি শিঙ্গা ধারণ করে আছেন। তাঁর শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারে কিয়ামত এবং দ্বিতীয় ফুৎকারে হাশর অনুষ্ঠিত হবে। ৪. হজরত আজরাইল আ.– ইনি সমস্ত সৃষ্টজীবের রূহ কবজ করার দায়িত্ব পালন করেন।

এই চারজন ছাড়া আরো অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যভাজন ফেরেশতা আছেন। তাঁদের মধ্যে আটজন মহাসম্মানিত ফেরেশতা আল্লাহ্‌তায়ালার আরশ ধরে আছেন। এঁরা আকারে অতি বৃহৎ। তাঁদের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত দূরত্ব দুশ’ বছরের পথের দূরত্বের সমান। আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, সাতশ’ বছরের রাস্তার দূরত্বের সমান।

শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেন ‘এ কথার উপর বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালাই ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা নূরের তৈরী।

তাঁরা যে কোনো আকার ধারণ করতে পারেন। তাঁদের রূহ এবং শরীরই তাঁদের পোশাক। ফেরেশতাদের মধ্যে নারী পুরুষ বলে কিছু নেই। তাঁদের বংশবিস্তারও নেই। আকাশ ও পৃথিবীর সকল জায়গায় তাঁরা কর্মরত। তাঁরা এই বিশ্বজগতের তত্ত্বাবধায়ক এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী। একজন মানুষের সঙ্গে কয়েকজন ফেরেশতা থাকেন। কেউ আমল লেখেন, কেউ হেফাজত করেন শয়তান এবং ক্ষতিকর অনেককিছু থেকে। ঊর্ধ্ব ও অধঃ জগতের সকল পরিসর তাঁদের কার্যতৎপরতায় মুখর। হাদিস শরীফে এসেছে, সমগ্র সৃষ্টিজগতকে দশভাগে ভাগ করলে নয় ভাগ হবে শুধু ফেরেশতা। ফেরেশতারা পাখা অথবা বাহুবিশিষ্টও হন। তাঁদের মধ্যে কারো কারো দুই, তিন কিংবা চার জোড়া পর্যন্ত পাখা হয়। কোরআন মজীদে ফেরেশতাদের বাহু সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এর উপরে ইমান রাখা জরুরী। তবে ফেরেশতাদের পাখার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালারই আছে। এরকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, পাখা তাদের শক্তির প্রতীক। ফেরেশতাদের নেতা হজরত জিবরাইল আ. এর ছয়শত পাখা দেখেছিলেন রসুলে আকরম স.। মেরাজ বিষয়ক হাদিসে এরকম বিবরণ আছে’।

এক হাদিসে এসেছে, রসুলে করিম স. বলেন, প্রত্যেক ইমানদার ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে তার নিরাপত্তার জন্য তিনশ’ ষাট জন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। তাঁরা তাঁর প্রত্যেক অঙ্গের হেফাজত করেন। তার মধ্যে সাতজন ফেরেশতা রয়েছেন কেবল চোখের নিরাপত্তাবিধানের কাজে নিয়োজিত। নিশ্চিত ও নির্ধারিত নয়, এরকম বিপদাপদ থেকে তাঁরা মানুষকে এমনভাবে নিরাপদ রাখেন, যেমন মধুর পাত্রের দিকে ছুটে আসা মাছির দলকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে তাড়িয়ে দেয়া হয়। মানুষের জন্য এরকম নিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত। কুরতুবী।

২৩ ইমানের বিবরণ

ইমানের অর্থ দ্বীনের বিষয়ে প্রকাশ্য বা সঠিকভাবে যা কিছু আমাদের নিকট এসেছে, তার প্রতি কলব বা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা। মৌখিক স্বীকারোক্তিকেও

অবশ্য ইমানের একটি রোকন বা স্তম্ভ বলা হয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো তা পরিত্যাজ্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, কোনো ব্যক্তি বাকশক্তিহীন হলে অথবা কারো বলপ্রয়োগের ফলে কেউ কুফরী কলেমা বলে ফেললেও তার অন্তরে ইমান থাকা সম্ভব। এরকম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও সে ইমানসহই মরবে। অর্থাৎ আন্তরিক ইমানই প্রকৃত ইমান। মৌখিক স্বীকৃতি শর্ত নয়।

ইমানের দাবী এই যে, ইমানদার ব্যক্তি অবশ্যই কুফর, কাফেরী এবং তার আনুষঙ্গিক কাজ থেকে বিমুখ থাকবে। যে ব্যক্তি ইমানের দাবী করে এবং কুফরী আচার-আচরণের উপরে কায়েম থাকতে চায়, সে দুই ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনকারী। মুনাফিক। সে এদিকের নয়। ওই দিকেরও নয়। নিখুঁত ইমানের অধিকারী হতে গেলে কুফরী থেকে বিমুখ হওয়া ব্যতিরেকে কোনো উপায়ই নেই। এই বিমুখতার সর্বনিম্ন স্তর কলব বা অন্তঃকরণ দ্বারা বিমুখ হওয়া এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর কলব এবং কালাব বা দেহ দ্বারা বিমুখ হওয়া। তার মানে আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা করা। কাফেরদের দ্বারা চরম কোনো অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকলে কলব দ্বারা করা। নাহলে কলব ও কালাব দ্বারা করা।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন–

'হে নবী! কাফের এবং মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করুন'। সূরা তাহরীম, ৯ আয়াত।

আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসুল স. এর প্রেম-ভালোবাসা-মহব্বত তাঁদের শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা ব্যতীত সংঘটিত হয় না। হজরত ইব্রাহিম আ. যে বুজর্গী এবং মাহাত্ম্য লাভ করেছেন, তা আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রুদের থেকে বৈমুখ্যের কারণেই পেয়েছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন–

'নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তাঁর অনুগামীদের সুন্দর অনুসৃতি রয়েছে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্তের উপাসনা করো, তাদের প্রতি বিমুখ। আমরা তোমাদেকে অমান্য করলাম। আমাদের সঙ্গে তোমাদের চিরকালীন প্রকাশ্য শত্রুতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ইমান আনো'। সুরা মুমতাহিনা, ৪ আয়াত।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন 'এই ফকিরের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের ক্ষেত্রে এই বিমুখতার তুল্য কোনোকিছুই নেই।

আমি স্পষ্ট অনুভব করছি যে, কুফর ও কাফেরীর সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তাগত শত্রুতা আছে। পৌত্তলিক এবং বিগ্রহপূজকেরা আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তাগত শত্রু। চিরস্থায়ী দোজখবাস এই দুষ্কর্মেরই প্রতিফল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ উপাস্য যথা অসৎ উদ্দেশ্যসমূহ এবং সকল প্রকার অসৎকাজ এরকম নয়। মূর্তিপূজা ও অংশিবাদিতা ছাড়া অন্যান্য অসৎ কাজের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার ক্রোধ সেফাতী বা গুণজাত। ওই সকল কার্যফলের আজাব সাময়িক। তাই চিরস্থায়ী অগ্নিবাসী হওয়া তার প্রতিফল নির্ধারণ করা হয়নি। বরং তাদের ক্ষমা আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীন।

জানা প্রয়োজন যে, কুফর এবং কাফেরদের সঙ্গে যখন আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তাগত শত্রুতা প্রমাণিত হলো, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার সুন্দর এবং শান্ত গুণসমূহের রহমত এবং অনুগ্রহ কাফেরেরা কিছুতেই পাবে না। কারণ, রহমত বা অনুকম্পা গুণ সত্তাগত ক্রোধ বিদূরিত করতে সক্ষম নয়। সত্তাগত সম্বন্ধ গুণজাত সম্বন্ধ অপেক্ষা দৃঢ় ও উচ্চ। সিফাতের চাহিদা জাতের চাহিদাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে 'আমার অনুকম্পা আমার রোষ অপেক্ষা অগ্রগামী'। – এর অর্থ গুণজাত ক্রোধ, যা পাপী মুমিনদের জন্য বিশিষ্ট। মুশরিকদের জন্য যে জাতি গজব বা সত্তাগত ক্রোধ, তা নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইহজগতে তো কাফেরেরাও মুমিনদের মতো রহমতের অংশীদার। তাহলে ইহজগতে কীভাবে গুণজাত রহমত জাতি শত্রুতা বিদূরিত করলো?

উত্তরঃ ইহজগতে কাফের মুনাফিকেরা যে রহমত লাভ করে, তা প্রকৃতপক্ষে প্রবঞ্চনা। ছলনামূলক শান্তি।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন–

'তারা কি মনে করেছে আমি তাদেরকে ধনজন দিয়ে সাহায্য করছি এবং এভাবে তাদেরকে দ্রুতবেগে উৎকর্ষতার দিকে নিয়ে যাচ্ছি, বরং তারা বুঝতে পারছে না'। সূরা মু'মিনুন, ৫৫-৫৬ আয়াত।

আল্লাহ্‌পাক আরো এরশাদ করেছেন–

'আমি তাদেরকে এমনভাবে (ধ্বংসের দিকে) ধীরে ধীরে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেই পারবে না এবং এভাবেই তাদেরকে প্রশ্রয় দিতে থাকি। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত নিপুণ'। সূরা আ'রাফ, ১৮২-১৮৩ আয়াত।

২৪ দোজখের শাস্তি

চিরস্থায়ী দোজখের অগ্নিবাস কুফরের প্রতিফল। কোনো ব্যক্তি ইমান অন্তরে রাখা সত্ত্বেও যদি কুফরী রীতিনীতি প্রতিপালন করে এবং কাফের মুশরিকদের ব্রতাচার ইত্যাদির সম্মান করে, আলেমগণ তাকে মুরতাদ বা পথভ্রষ্ট বলে গণ্য করেন। আলেমগণের এই ফতোয়া অনুযায়ী তাদের চিরস্থায়ী আজাব হওয়া উচিত। অথচ সহি হাদিসে এসেছে 'যার অন্তরে রাই সরিষা পরিমাণ ইমান থাকবে, সে দোজখ থেকে মুক্তি পাবে। তার চিরস্থায়ী আজাব হবে না'।

এরূপ জটিলতার সমাধান এই যে, আল্লাহ্ না করুন ওই ব্যক্তি যদি নিছক কাফের হয়, তবে তার জন্য চিরস্থায়ী আজাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিধর্মীদের নিয়মাবলী বাহ্যিকভাবে পালন করা সত্ত্বেও যদি সামান্য পরিমাণ ইমান তার অন্তরে থাকে, তবে সে দোজখের শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও কোনো এক সময়ে পরিত্রাণ লাভ করবে। এই পরিত্রাণ হবে তার ওই অনুপরিমাণ ইমানের বরকতেই।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন 'এই ফকির একদিন এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছিলেন। সে ছিলো মৃত্যুপথযাত্রী। আমি তার আত্মিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, তার কলব খুবই অন্ধকারাচ্ছাদিত। অন্ধকার দূর করবার জন্য আত্মিক তাওয়াজ্জোহ্ নিক্ষেপ করলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। পরে বুঝলাম, এই অন্ধকার কুফরের অন্ধকার। কুফর এবং কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই এই কঠিন অন্ধকার জমা হয়েছে তার কলবে। এই অন্ধকার তাওয়াজ্জোহতে দূর হবে না। এই তমসামুক্তির জন্য তার অগ্নিবাস নিশ্চিত। তবে আমি এটাও জানতে পারলাম যে, এই কঠিন অন্ধকারের মধ্যেও তার অন্তরে অণু পরিমাণ ইমান আছে, যার বরকতে অবশেষে সে নাজাত লাভ করবে। এরকম অবস্থা দেখে ভাবলাম, এ ব্যক্তির জানাজার নামাজে শামিল হবো কিনা। কিন্তু সাথে সাথেই বুঝলাম, জানাজা পড়তে হবে। বুঝলাম, যে মুসলমান ইমান রাখা সত্ত্বেও বিধর্মী কাফেরদের রীতিনীতি প্রতিপালন করে এবং তাদের নির্দিষ্ট দিনসমূহের সম্মান করে, তার জানাজা পড়তে হবে। যেরূপ ইদানীং প্রচলিত, সেরকমভাবে

তাদেরকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা চলবে না। আশান্বিত হয়ে থাকতে হবে যে, ওই সামান্যতম ইমানের বরকতে আল্লাহ্পাক তাকে চিরস্থায়ী দোজখের আযাব থেকে মুক্তিদান করবেন। সুতরাং জানা গেলো, কাফেরদের জন্য ক্ষমা নেই।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন–

'নিশ্চয় আল্লাহ্পাক শিরিককারীকে ক্ষমা করবেন না'। সূরা নিসা, ৪৮ আয়াত।

নিছক কাফের হলে চিরস্থায়ী আজাব। আর অতি সামান্য ইমান থাকলেও একসময় দোজখমুক্তি। – এরকমই বিশ্বাস রাখতে হবে। আর অন্যান্য কবীরা গোনাহ্ আল্লাহ্পাক ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে সাময়িক আজাবও দিতে পারেন। এই ফকিরের নিকট দোজখের আজাব সাময়িক হোক কিংবা স্থায়ী, কুফরের রীতিনীতির জন্য বিশিষ্ট।

যে কবীরা গোনাহ্কারীরা তওবা করেনি, শাফায়াত বা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়নি, যাদের পাপ পার্থিব কষ্টবিপদ কিংবা মৃত্যুকষ্ট দ্বারা সংশোধিত হয়নি, আশা করা যায় তাদের কাউকে কাউকে হয়তো আল্লাহ্পাক কেবল কবরের আজাব দিয়েই ক্ষান্ত হবেন। কাউকে কবর আজাবসহ কিয়ামতের কষ্ট, পেরেশানি ও আতংক দ্বারা গোনাহর ক্ষতিপূরণ করে দিবেন। এরকম কোনো গোনাহ্ অবশিষ্ট রাখবেন না, যাতে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে হয়।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন–

'যারা ইমান এনেছে এবং যাদের ইমান জুলুম বা কুফরের সঙ্গে মিশ্রিত হয় নি, তাদের জন্যই শান্তি'। সূরা আনআম, ৮২ আয়াত।

আল্লাহ্পাকই সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

যদি কেউ বলে, কুফর ব্যতীত অন্যান্য গোনাহর জন্যও তো দোজখের আজাবের নির্দেশ এসেছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন–

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছা পূর্বক হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। চিরদিন সে সেখানে অবস্থান করবে'। সূরা নিসা, ৯৩ আয়াত।

হাদিস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করবে, সে এক হোকবা বা আশি বছর দোজখের শাস্তি ভোগ করবে। এতে করে বোঝা যায় কেবল কাফেরদের জন্য দোজখের শাস্তি নির্দিষ্ট নয়। – এর সমাধান এই যে, মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করার অর্থ হত্যাকাণ্ডকে হালাল মনে করা। হারামকে হালাল যে মনে করে সে কাফের, যেমন তাফসীরকারগণ লিখেছেন। কুফর ছাড়া অন্যান্য যে সকল গোনাহ্র শাস্তির জন্য দোজখ নির্ধারিত হয়েছে, সে সকল গোনাহ্ কুফরের সংমিশ্রণশূন্য নয়। যেমন, গোনাহ্কে সামান্য অপরাধ মনে করা, অবাধে ও নির্ভয়ে গোনাহ্ করা এবং শরিয়তের আদেশ-নিষেধকে তুচ্ছ জানা।

হাদিস শরীফে এসেছে 'আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্কারীদের জন্য'। আরো এসেছে 'আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। পরকালে তাদের জন্য কোনো শাস্তি নেই'।

২৫ ইমান বাড়ে কমে কি না

ইমান বাড়ে কমে কি না এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমামে আজম র. বলেন, 'ইমান বাড়েও না। কমেও না'। ইমাম শাফী র. বলেন 'ইমান বাড়ে এবং কমে'। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহ যে, কলব বা অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে ইমান বলা হয়, যাতে বাড়া-কমার কোনো অবকাশই নেই। যা বাড়ে কমে তা প্রকৃতপক্ষে জন্ন বা সন্দেহ। সন্দেহ তো ইমানবিরোধী বিষয়।

সৎআমল ইমানকে নির্মল ও নূরানী করে। আর অসৎ আমল ইমনাকে করে অপরিচ্ছন্ন। অতএব পরিস্কৃতি ও নির্মলতার দিক দিয়ে ইমান বাড়ে অথবা কমে– একথা অবশ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু অস্তিত্বগতভাবে বাড়ে কমে না। অনুজ্জ্বল ইমান অপেক্ষা উজ্জ্বল ইমান বড়ো– এরকম কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। আবার কেউ অনুজ্জ্বল, অপরিচ্ছন্ন ইমানকে ইমান বলেই গণ্য করেন না। তাঁরা নূরানী একিনকে প্রকৃত একিন বলেন এবং অস্বচ্ছ ইমানকে অপূর্ণ ধারণা করে থাকেন। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন তাঁরা দেখলেন, এই কমবেশী হওয়া একিনের গুণাবলীর তারতম্য মাত্র। নিছক একিনের মধ্যে ন্যূনাধিক্য হওয়া নয়। তাই তাঁরা 'একিন বাড়ে না, কিন্তু অপূর্ণ' – একথা বলে থাকেন। যেমন স্বচ্ছতার তারতম্যবিশিষ্ট দু'টি সমআকারের আয়না দেখে কেউ বললো 'উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন আয়নাটি অপরিষ্কার আয়নাটি থেকে বড়ো'। আবার কেউ বললো 'আয়না দু'টি আকার আয়তনে বড় ছোটো নয়। তবে এদের স্বচ্ছতার মধ্যে কম বেশী আছে'। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির লক্ষ্য ও বক্তব্যই অধিকতর সঠিক বলা যাবে। প্রথম ব্যক্তির লক্ষ্য আকৃতির প্রতি। প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি নয়।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন–

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং এলেম প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মর্যাদাসমূহকে আল্লাহ্তায়ালা উচ্চ করে থাকেন'।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন 'এই ফকির যে সমাধান প্রকাশ করতে সক্ষম হলেন, তার দ্বারা 'ইমান বাড়ে কমে না' মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। সাধারণ মুমিনের ইমান পয়গম্বর আ.গণের ইমানের মতো নয়। কেননা, তাদের বিশ্বাস কমবেশী তমসাচ্ছাদিত। পয়গম্বর আ.গণের ইমান পূর্ণ নূরানী এবং বহুগুণ বেশী ফলদায়ক। 'হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর ইমান এই উম্মতের সকলের ইমান অপেক্ষা ওজনে বেশী' –এই হাদিসের অর্থও এভাবে বুঝতে হবে যে, এই বেশী হওয়ার অর্থ উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা এবং পূর্ণতা গুণের দিক থেকে বেশী হওয়া। পয়গম্বর আ. মানুষ হিসাবে সাধারণ মানুষের মতো। উভয়ের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রতঙ্গ সবই এক। কিন্তু কামালিয়াত ও ফযীলতের দিক দিয়ে পয়গম্বরগণই শ্রেষ্ঠ। বরং অন্যান্য মানুষ যেনো তাঁদের তুলনায় কিছুই নয়। অথচ মানুষ হিসাবে আকার আয়তনের দিক থেকে সবাই এক। সুতরাং একথা বলা যাবে না যে, মানুষ হওয়ার মধ্যে কমবেশী হয়। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

অনেকে এরকমও বলে থাকেন যে, 'তাসদীক্ব' বা বিশ্বাসের অর্থ তর্কশাস্ত্রের পারিভাষিক 'তাসদীক্ব'– যার মধ্যে বিশ্বাস ও সন্দেহ দু'টোই থাকতে পারে। অতএব, প্রকৃত ইমানের মধ্যেই কমবেশী হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 'তাসদীক্ব' শব্দের অর্থ একিন বা কলবের দৃঢ় বিশ্বাস। সাধারণ অর্থে যেখানে 'সন্দেহ' শামিল থাকে, তা নয়।

ইমামে আজম র. বলেছেন 'আনাল হক মুমিন-আমি সত্য ইমানদার'। আর ইমাম শাফী র. বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আমি মুমিন'। উভয় বাক্যের মধ্যে শব্দগত তারতম্য থাকলেও উদ্দেশ্য এক। প্রথম বাক্য বর্তমান ইমানজ্ঞাপক। দ্বিতীয় মত ইমানের শেষ অবস্থার অনুকূল। তবে বাহ্যত 'ইনশাআল্লাহ্' (যদি আল্লাহ্ চান) শব্দ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কারণ ইমান তার নিঃসন্দিগ্ধ স্বীকৃতি চায়।

আমল ইমানের অংশ নয়। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস। শুধু জানা বা চেনার নামও ইমান নয়। যেমন মদীনার ইহুদীরা রসুলে আকরম স.কে জানতো, চিনতো। কিন্তু বিশ্বাস করতো না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন–

'তারা নবীকে এমনভাবে চিনে, যে রকম চিনে তাদের সন্তানকে'। সূরা আনআম, ২০ আয়াত।

শায়েখ আবদুল হক দেহলভী র. বলেন 'আমল ব্যতীত ইমান অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু প্রকৃত ইমানতো অন্তরের বিশ্বাসই। ইমান ওই বৃক্ষের মতো যার কাণ্ড বিশ্বাস এবং আমল-আনুগত্য ফুল ও ফসল। যে গাছে পত্রপল্লব-ডালপালা নেই

প্রকৃতপক্ষে তাকে পূর্ণ বৃক্ষ বলা যায় না। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইমান ওটাই, যা নেক আমলের পত্রপুষ্প দ্বারা সজ্জিত থাকে। বেআমল ব্যক্তি অসম্পূর্ণ ইমানের অধিকারী। তবুও অসম্পূর্ণ ইমানকে ইমানই বলতে হবে। কোরআনুল করীমের বহু স্থানে ইমান ও আমলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে–

'যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করে' সূরা আসর, ২ আয়াত।

এই আয়াতের মাধ্যমে একথা পরিষ্কার যে, মূল ইমান হচ্ছে অন্তরের অটল বিশ্বাস। আর নেক আমল অন্য জিনিস।

২৬ আউলিয়াগণের কারামত

আউলিয়াগণের কারামত সত্য। ওলি আল্লাহ্গণ থেকে অলৌকিক ঘটনা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পাওয়ার কারণে এ যেনো হয়েছে তাঁদের চিরস্থায়ী স্বভাবগত বস্তু। কারামত অস্বীকারকারী আসলে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ও স্বাভাবিকত্ববিরোধী।

ওই ব্যক্তিই ওলিআল্লাহ্, যিনি মারেফাত লাভ করেছেন। যিনি ইবাদত বন্দেগীতে দৃঢ়, গোনাহ্ থেকে এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত। এ ধরনের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকেই কারামত বলে। ওলির কারামত, নবীর মোজেজার প্রতিবিম্ব। মোজেজা নবুয়তের দাবীর অন্তর্ভূত। কিন্তু কারামত দাবীর বিষয় নয়। কোনো কারামত ইচ্ছাকৃত, আবার কোনো কারামত অনিচ্ছাকৃত হয়ে থাকে।

বেলায়েতের চিহ্ন হিসাবে অবশ্য কারামত প্রকাশিত হওয়া জরুরী নয়। কারামত ছাড়াও ওলিআল্লাহ্ হওয়া সম্ভব। আসল কারামত হলো সুন্নতে রসুল স. এর উপরে অটল থাকা।

নবী ও ওলিগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করা। 'মাআরেফুল কোরআন' রচয়িতা বলেন 'যারা আল্লাহ্র রসুল অথবা কোনো ওলির সঙ্গে অসৎ আচরণ করে, তারা প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ্র সঙ্গেই অসৎ আচরণ করে'। একথায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবী এবং ওলিগণের মর্যাদা কতো ব্যাপক ও উচ্চ।

২৭ সত্যের মাপকাঠি

সাহাবায়ে কেরাম রা. সত্যের মাপকাঠি। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন–

'অতএব তারা যদি ইমান আনে, যেমন ইমান এনেছো তোমরা, তবে তারা সুপথ পাবে'। সূরা বাকারা, ১৩৭ আয়াত।

এ সম্পর্কে তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন রচয়িতা বলেন 'এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ এবং ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কেননা 'যেমন ইমান এনেছো তোমরা' বাক্যে রসুলে আকরম স. ও সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই আয়াতে তাঁদের ইমানকে আদর্শ ইমানের মাপকাঠি নির্ধারণ করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালার কাছে গ্রহণীয় ও পছন্দনীয় ইমান হচ্ছে সেরকম ইমান, যা রসুলে পাক স. এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ইমান ও বিশ্বাস তাঁদের ইমান থেকে চুল পরিমাণ ভিন্ন, সে ইমান আল্লাহ্তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়'।

মোরতাদ মওদুদী এবং তার অনুসারীরা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানে না। আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত উম্মতকে এদের ফেৎনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

'হেকায়েতে সাহাবা' রচয়িতা কাযী আয়াজ র. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'সাহাবীগণের সম্মান করা রসুলে আকরম স. এর সম্মান করার মতো। তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, তাঁদের অনুকরণ করা, তাঁদের প্রশংসা করা, তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের মধ্যে পরস্পরের মতবিরোধ সম্পর্কে মৌন থাকা একান্ত আবশ্যক'।

রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন 'আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো! আল্লাহ্কে ভয় করো! তাঁদেরকে গালি-দোষারোপের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না। যে তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে বলেই তাদেরকে ভালোবাসে। যে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে, সে আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে বলেই তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে যেনো আমাকেই

কষ্ট দেয়। যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কেই কষ্ট দেয়। আর যে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়, অতিশীঘ্রই সে আজাববেষ্টিত হবে'। রসুল স. আরো বলেছেন 'আমার সাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ যব খরচ করার সমান সওয়াব পাবে না'। তিনি স. আরো বলেছেন 'যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদের দোষারোপ করে, তার উপর আল্লাহ্তায়ালার লানত, ফেরেশতাদের লানত এবং সমস্ত মানুষের লানত। তার ফরজ, নফল– কোনো ইবাদতই আল্লাহ্ কবুল করবেন না'।

যে ব্যক্তি সাহাবীদের প্রশংসা করে, সে ব্যক্তি মুনাফেকি থেকে পবিত্র থাকে। আর যে তাঁদের শানে বেআদবী করে, সে বেদাতী, মুনাফিক এবং সুন্নতের প্রতিপক্ষ।

হাদিস শরীফে এসেছে 'আমার সাহাবা এবং আমার জামাত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থেকো। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন'। অন্য হাদিসে এসেছে 'যে ব্যক্তি সাহাবীদের ব্যাপারে আমার খেয়াল রাখবে, কিয়ামতের দিনে আমি হবো তার রক্ষক'।

হাদিস শরীফের নির্দেশানুসারে ১. সাহাবীদের দোষচর্চাকারীদের পিছনে নামাজ পড়া যাবে না ২. তাদের মেয়ে বিয়ে করা যাবে না ৩. তাদের ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং ৪. তাদের জন্য দোয়া করা যাবে না। উল্লেখ্য, সালাম আদান-প্রদান, জানাজা পড়া ইত্যাদি বিষয়ও দোয়ার অন্তর্ভূত।

সাহাবীগণের দুর্নামকারী দল তিনটি। ১. শিয়া ২. খারেজী ৩. মওদুদী। আহসানুল ফতোয়া গ্রন্থের অভিমত– কোনো মসজিদের ইমামকে মওদুদী মতবাদের অনুসারী বলে জানা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এ দায়িত্ব মসজিদ কমিটির। কমিটি দায়িত্ব পালন না করলে মহল্লাবাসীদের দায়িত্ব ইমাম এবং কমিটিকে অপসারিত করা।

২৮ খোলাফায়ে রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব

খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটা তাঁদের খেলাফতের ক্রম অনুযায়ী জানতে হবে। হজরত আলী রা. অপেক্ষা হজরত ওসমান রা. হজরত

ওসমান রা. এর চেয়ে হজরত ওমর রা. এবং হজরত ওমর রা. এর চেয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. শ্রেষ্ঠ।

বিষয়টি হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'শায়েখায়েনের (হজরত সিদ্দীকে আকবর এবং হজরত ফারুকে আজম) শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের এজমা বা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আলেমগণ তাঁদের পূর্ববর্তী ইমামগণ থেকে সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে ইমাম শাফী র. ও আছেন'। শায়েখ ইমাম আবুল হাসান আশআরী বলেছেন 'নিশ্চয় সমস্ত উম্মতের উপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. শ্রেষ্ঠ, তৎপর শ্রেষ্ঠ হজরত ওমর রা.। এই সিদ্ধান্ত সঠিক, যথার্থ এবং অকাট্য। ইমাম জাহাবী বলেছেন, হজরত আলী রা. এর খেলাফতের সময়েই তাঁর নিকট থেকে বহুসংখ্যক ব্যক্তির মাধ্যমে একথা প্রকাশ্যে বর্ণিত হয়ে আসছে যে, হজরত আবু বকর রা. এবং হজরত ওমর রা. এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ'। তারপর তিনি এও বলেছেন 'এই কথাটি হজরত আলী রা. এর সূত্রে আশিজনেরও বেশী বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন'। এরপর তিনি বলেছেন, রাফেজীগণকে আল্লাহ্তায়ালা ধ্বংস করুন। তারা কতই না অজ্ঞ। ইমাম বোখারী হজরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন 'হজরত আলী রা. একবার বললেন, হজরত নবীয়ে করিম স. এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মান্যবর আবু বকর, তারপর মান্যবর ওমর। তারপর আর একজন। তাঁর পুত্র মোহাম্মদ হানাফিয়া বললেন, তারপর আপনি? উত্তরে তিনি বললেন 'আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন মাত্র'।

ইমাম জাহাবী ও অন্যান্য ইমামগণ হজরত আলী রা. থেকে সহীহ্ হাদিস বর্ণনা করেছেন– তিনি বলেছেন, 'সাবধান হও! আমার নিকট এই তথ্য উপনীত হয়েছে যে, অনেকেই আমাকে মান্যবর আবু বকর এবং মান্যবর ওমর থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এরকম মতাবলম্বী কাউকে পেলে আমি তাকে মিথ্যা দোষারোপকারী বলবো এবং তার প্রতি ওই শাস্তি প্রয়োগ করবো, যেরকম শাস্তি অপবাদকারীকে দেয়া হয়'। ইমাম দারাকুতনী র. হজরত আলী রা. থেকে এই মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, 'যে ব্যক্তিকে আমি শ্রদ্ধেয় আবু বকর এবং শ্রদ্ধার্হ ওমর অপেক্ষা আমাকে শ্রেষ্ঠ বলতে দেখবো, তাকে বেত্রাঘাত করবো– যেরকম বেত্রাঘাত করা হয় অপবাদকারীকে'। এরকম কথা তাঁর নিকট থেকে এবং অন্যান্য সাহাবীগণের নিকট থেকে অনেকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও শিয়াদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম আবদুর রাজ্জাকও বলেছেন 'আমি শায়েখায়েনকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করছি, যেহেতু

হজরত আলী নিজে তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। নতুবা আমি তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতাম না। আর আমার ধ্বংসের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমি হজরত আলীকে ভালোবাসি এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণও করি'। – এই বিষয়গুলি 'সওয়ায়েক' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

হজরত ওসমান রা. এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, হজরত শায়েখায়েনের পর হজরত ওসমান রা. শ্রেষ্ঠ। তারপর হজরত আলী রা.। মুজতাহিদ ইমাম চতুষ্টয়ের মতও এরকম। এ বিষয়ে ইমাম মালেক র. এর দ্বিধা ছিলো। কিন্তু কাযী আয়াজ র. বলেছেন, পরে তিনি হজরত ওসমান রা. এর শ্রেষ্ঠত্বের দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ইমাম কুরতুবী র. বলেছেন 'এটাই সত্য ইনশাআল্লাহু তায়ালা'।

ইমামে আজম র. বলেছেন 'সুন্নত জামাতের দলভুক্ত হওয়ার চিহ্ন শায়েখায়েনকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা এবং খাতানায়ন (হজরত ওসমান এবং হজরত আলী)কে ভালোবাসা'– একথায় হজরত ওসমান রা. এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে ইতস্ততঃভাব বোঝা যায়। কিন্তু না। এরকম উক্তির অন্য কারণ আছে। অর্থাৎ খাতানায়নের খেলাফতের সময় অনেক রকম বিপর্যয় ঘটেছিলো, যার কারণে সাধারণের মন কলুষিত ও তমসাচ্ছন্ন হয়েছিলো। এসব দিকে লক্ষ্য রেখেই ইমাম আবু হানিফা খাতানায়নের প্রতি 'ভালোবাসা' শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁদের মহব্বতকেই সুন্নতের চিহ্ন বলে ব্যক্ত করেছেন। এরকম নয় যে, হজরত ওসমান রা. এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন। কেমন করে দ্বিধা থাকা সম্ভব? হানাফী মাজহাবের গ্রন্থসমূহ এই মন্তব্যে ভরপুর যে 'খোলাফায়ে রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব খেলাফতের ক্রমানুসারে'।

ফলকথা, শায়েখায়নের শ্রেষ্ঠত্ব সঠিক ও অকাট্য। হজরত ওসমান রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব সেরকম অকাট্য নয়। অবশ্য প্রশস্ত পথ এটাই যে, হজরত ওসমান রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারকারীকে, বরং শায়েখায়নের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারকারীকেও যেনো আমরা কুফরের নির্দেশ প্রদান না করি। বরঞ্চ বেদাতী এবং পথভ্রষ্ট বলে জানি। যেহেতু এরকম ব্যক্তিকে কাফের বলার বিষয়ে আলেমগণের দ্বিমত আছে এবং এ বিষয়ে ঐকমত্যের ব্যাপারটিও সন্দিগ্ধ। কিন্তু তাঁদের ক্রমানুসারের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারকারী ব্যক্তি হতভাগ্য এজিদের সঙ্গী। অতএব, সাবধানতাহেতু তাকেও মালউন বা অভিশপ্ত বলতে ইতস্ততঃ করেছেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনকে কষ্ট প্রদানের কারণে আমাদের নবী স. ওই রকমই ব্যথিত হন, যেমন হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রা. এর জন্য কষ্ট পেয়েছিলেন'।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. আরো বলেন 'শরহে আকায়েদে নাসাফীর মধ্যে মাওলানা ছাআ'দউদ্দিন এই শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে যা ইনসাফ বলে ধারণা করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে ইনসাফ পদবাচ্য নয় এবং তিনি যেভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বকে নাকচ করতে চেয়েছেন, তা অমূলক। কেননা, আলেমগণের নির্ধারণ এই যে, সওয়াব বা পুণ্যের আধিক্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট শ্রেষ্ঠ হওয়াই এখানে উদ্দেশ্য। প্রশংসার প্রাচুর্য অনুসারে নয়। যেহেতু সাহাবা এবং তাবেয়ীগণ থেকে তাঁদের পরবর্তীগণ হজরত আলী রা. এর যেরকম প্রশংসা বর্ণনা করেছেন, অন্য সাহাবীগণের সেরকম প্রচুর প্রশংসা বর্ণিত হয়নি। ইমাম আহমদ র. বলেছেন, হজরত আলীর মতো অন্য কোনো সাহাবীর এরকম প্রচুর প্রশংসা বর্ণিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও তিনি পূর্ববর্তী খলিফাত্রয়ের শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, জানা গেলো যে, প্রশংসাপ্রশস্তি ছাড়াও শ্রেষ্ঠত্বের অন্য কারণ বিদ্যমান। 'ওহী' বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়া যাঁদের প্রত্যক্ষগোচরে ছিলো, তাঁরাই প্রকাশ্যে এবং প্রকারান্তরে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরাই হচ্ছেন রসুল স. এর সাহাবীবৃন্দ (রদ্বিআল্লাহু আনহুম)। অতএব আকায়েদে নাসাফীর ব্যাখ্যাকারের 'শ্রেষ্ঠত্বের উদ্দেশ্য যদি সওয়াবের আধিক্য হয়, তাহলে ইতস্ততঃ করার কারণ বর্তমান আছে'– এই বাক্যটি পরিত্যাজ্য। কেননা ইতস্ততঃ করার অবকাশ থাকতো, যদি সাহেবে শরিয়ত রসুল স. এর নিকটে এ বিষয়ে প্রকাশ্য প্রমাণ না থাকতো। অথবা ইঙ্গিতে অবগতি লাভ সম্ভব না হতো। অবগতির পর আর ইতস্ততঃ ভাব কেনো? অবগতি ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশ দানই বা কী করে সম্ভব'?

তিনি আরো বলেন 'ফতুহাতে মক্কিয়া' রচয়িতা বলেছেন, 'তাঁদের খেলাফতকালের ক্রম তাঁদের আয়ুষ্কাল অনুযায়ী'। তাঁর এই বাক্যটিও তাঁদের সমতুল্য হওয়ার ইঙ্গিত করে না। যেহেতু খেলাফত পৃথক বস্তু এবং শ্রেষ্ঠত্ব পৃথক। যদি সমতুল্য হওয়াটা মেনে নেওয়া হয়, তাহলেও তাঁর এরকম বাক্য এবং এরকম অন্যান্য সকল বাক্য হবে সামঞ্জস্যবিহীন শরিয়তগর্হিত বাক্যের মতো, যা ধর্তব্য নয়। তাঁর অধিকাংশ কাশ্‌ফজাত মারেফত বা জ্ঞান– যা সুন্নত জামাতের এলেমের বিপরীত, তা সত্যতা থেকে দূরে। অতএব, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া এরকম বাক্যের অনুগমন কেউই করবে না'।

২৯ সাহাবীগণের মর্যাদা ঃ এক

চার খলিফাসহ দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীকে একত্রে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বলা হয়। নবী পাক স. এই দশজনকে জান্নাতী হওয়ায় সুসংবাদ দিয়েছেন। এঁরা হচ্ছেন ১. হজরত আবু বকর ২. হজরত ওমর ৩. হজরত ওসমান ৪. হজরত আলী ৫. হজরত তালহা ৬. হজরত যোবায়ের ৭. হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ৮. হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ৯. হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ ১০. হজরত আবু উবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ্ (রদ্বিআল্লাহু আনহুম)।

এঁদের বেহেশতী হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু এ কথার অর্থ এরকম নয় যে, অন্য কারো বেহেশতে প্রবেশ নিশ্চিত নয়। কারণ, এঁরা ছাড়া আরো অনেককে রসুল স. বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান, হজরত হোসাইন, হজরত খাদিজা, হজরত আয়েশা, হজরত হামযা, হজরত আব্বাস, হজরত সালমান ফারসি, হজরত সুহাইব, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রদ্বিআল্লাহু আনহুম)– এঁরাও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।

শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেন 'প্রকৃত ব্যাপার এই যে, চার খলিফা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন ও অন্যান্য বুজর্গানে দ্বীনের সুসংবাদপ্রাপ্তি খুবই বিখ্যাত। কিন্তু দশজনের ব্যাপারটি অধিক খ্যাতি লাভ করেছে।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণকে আহলে বদর বলা হয়। তাঁদের সংখ্যা ছিলো তিন শত তেরো জন। ওই যুদ্ধে পাঁচ হাজার ফেরেশতা সাহাবীগণের সহযোদ্ধা ছিলেন। আহলে বদরের শানে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে ঃ

'আল্লাহ্ বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ সম্পর্কে বলেন, তোমরা যেরকম খুশী আমল করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য জান্নাত অপরিহার্য করে দিলাম'।

হাদিস শরীফে এসেছে, যে সকল ফেরেশতা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ফযীলত অন্যান্য ফেরেশতাদের চেয়ে বেশী।

বদরযোদ্ধাদের পরেই উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মর্যাদা। এই যুদ্ধ ছিলো কঠিন পরীক্ষা এবং চরম বিপদকণ্টকিত যুদ্ধ। রসুলে আকরম স. এর পবিত্র দাঁত এই যুদ্ধে ভেঙে গিয়েছিলো। তিনি আহত হয়েছিলেন। শহীদগণের নেতা হজরত হামযা রা. এই যুদ্ধেই শাহাদতের পেয়ালা পান করেছিলেন। এ ছাড়া আরো সত্তর জন সাহাবী এই যুদ্ধে শহীদ হন।

আহলে বায়াতে রিদওয়ানের ফযীলতও অত্যন্ত বেশী। বায়াতে রিদওয়ান ওই বরকতে ভরপুর বায়াত, যা সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রসুল আকরম স. এর পবিত্র হাতে করেছিলেন। কোরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়াত গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন...'। সূরা ফাতহ, ১৮ আয়াত।

হাদিস শরীফে এসেছে 'যারা আমার হাতে রিদওয়ান বৃক্ষের নিচে বায়াত করেছে, আগুনে প্রবেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তারা সকলেই বেহেশতী'।

উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম ছাড়াও আরো অনেক সাহাবীর মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদিস রয়েছে। কিন্তু সকলের পূর্ণ নাম তালিকা পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে একথা জানতে হবে যে, সকল সাহাবীই ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষভাজন, যেমন কোরআন মজীদ ঘোষণা করেছে 'রদ্বিআল্লাহু আনহুম ওয়া রদ্বূ আন'হু' (তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট)। আর আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন যাঁরা, তাঁরাতো অবশ্যই বেহেশতী।

কোনো কোনো আলেম সাহাবীগণের সন্তান-সন্ততিকেও তাঁদের বাপ দাদার ফযীলতের কারণে বেশী মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হজরত ফাতেমা রা. এর বংশধরেরাই বেশী ফযীলত রাখেন। হজরত ফাতেমা রা. বেহেশতী নারীগণের নেত্রী হবেন এবং ইমাম হাসান রা. এবং ইমাম হোসাইন রা. হবেন বেহেশতী যুবকদের নেতা।

হাদিস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে 'আমার আহলে বায়াত নবী নূহের কিশতীতুল্য। যে ব্যক্তি এই কিশতীতে আরোহণ করে, সে নিরাপদ'। আরো উল্লেখিত হয়েছে

'আহলে বায়াতের মহব্বত ইমানের অঙ্গ'। খাতেমা বিল খায়েরের (ইমানের সঙ্গে মৃত্যুর) জন্য বনী ফাতেমার মহব্বত খুবই ফলদায়ক।

বুজর্গানে দ্বীনের একটি বিখ্যাত দোয়া এই যে–

এলাহী বাহক্বে বনী ফাতেমা

কেহ্ বর কওলে ইমাঁ কুনি খাতেমা।

রসুলে আকরম স. এর পবিত্র সহধর্মিণীগণও বহুবিচিত্র ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারিণী। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারিণী হচ্ছেন হজরত খাদিজা রা. এবং হজরত আয়েশা রা.। আমাদের অন্যান্য জননীগণও অনেক ফযীলত রাখেন। এঁদেরকে একত্রে আযওয়াজে মোতাহ্হারাহ্ বলা হয়। এঁদের পবিত্র নামের তালিকা এরকম– ১. হজরত খাদিজা ২. হজরত সাওদা ৩. হজরত আয়েশা ৪. হজরত হাফসা ৫. হজরত জয়নাব বিনতে খুযায়মা ৬. হজরত উম্মে সালমা ৭. হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশ ৮. হজরত জুওয়াইরিয়া ৯. হজরত উম্মে হাবীবা ১০. হজরত সাফীয়া ১১. হজরত মায়মুনা (রদ্বিআল্লাহু আনহুমা)।

৩০ সাহাবীগণের মর্যাদা ঃ দুই

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আদর্শ এই যে, রসুলে আকরম স. এর সাহাবীগণকে সব সময় প্রশংসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। তাঁদেরকে মন্দ বলা, তাঁদের শানে বেআদবী করা, তাঁদেরকে হিংসা করা, অস্বীকার করা– লানতপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত হওয়ার আলামত। কেননা, তাঁরা হজরত নবীয়ে করিম স. এর পবিত্র সংসর্গের কারণে অক্ষয় পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার অধিকারী হয়েছেন।

সাহাবীগণের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিলো তা ছিলো ইজতেহাদী ইজতেহাদী ভুলের কারণে। স্বার্থসুবিধা অথবা প্রবৃত্তিপরায়ণতার কারণে নয়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেছেন 'সাহাবীগণের মধ্যে যে কলহ-বিবাদ ঘটেছিলো, তার উৎকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে হবে। ওই সকল ঘটনাকে নফসের আকাঙ্খা বা স্বার্থপরতা, দুরভিসন্ধি ইত্যাদি থেকে দূরবর্তী বলে ধারণা করা প্রয়োজন। ইমাম তাফতাজানী র. হজরত আলী রা.কে অতিরিক্ত মহব্বত করা সত্ত্বেও বলেছেন, তাঁদের মধ্যে যে বাদবিসম্বাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিলো, তা খেলাফতের অধিকারত্বের কারণে নয়। তা ছিলো বুঝবার ভুলের কারণে। তিনি টিকাভাষ্যে আরো লিখেছেন, নিশ্চয়ই হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং তাঁর দল হজরত আলী রা.কে সেই জামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং ইমাম মেনে নেওয়া সত্ত্বেও একটি সন্দেহের কারণে হজরত আলী রা. এর প্রতি বিদ্রোহী

হয়েছিলেন– তা হচ্ছে, হজরত ওসমান রা. এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। 'কোররা কামাল' পুস্তকের টিকায় হজরত আলী রা. এর বক্তব্য এরকম লিপিবদ্ধ আছে যে, তিনি বলেছেন 'তাঁরা আমাদের ভ্রাতা, আমাদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাঁরা কাফেরও নন। ফাসেকও নন। কারণ তাঁরা একটি ভাবার্থের উপরে মনস্থির করে আছেন'।

ইজতেহাদে বুঝবার ভুল নিন্দা-অপবাদের বিষয় নয়। নবীয়ে করিম স. এর সংসর্গের সম্মান রক্ষার্থে সকল সাহাবীর সম্মান রক্ষা করা উচিত। তাঁদেরকে ভালোভাবে স্মরণ করা আবশ্যক এবং রসুলে আকরম স. এর ভালোবাসা হেতু তাঁদেরকেও ভালোবাসা প্রয়োজন। রসুল স. এরশাদ করেছেন 'যে তাদেরকে ভালোবাসবে, সে আমার ভালোবাসার কারণেই ভালোবাসবে এবং যে তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, সে আমার প্রতি শত্রুতার কারণেই শত্রুতা করবে'– এর অর্থ এই যে, যে ভালোবাসা আমার সঙ্গে সম্বন্ধিত, সেই ভালোবাসা আমার সাহাবীর সঙ্গেও সম্বন্ধিত। আর আমার সঙ্গে যে শত্রুতা সম্পর্কিত, তা-ই সম্পর্কিত আমার সাহাবীগণের সঙ্গে।

হজরত আলী রা. এর বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীদের সঙ্গে আমাদের কোনো বন্ধুত্ব নেই। বরং তাঁদের প্রতি মনক্ষুণ্ন থাকাই উচিত। কিন্তু তাঁরা যেহেতু আমাদের পয়গম্বর স. এর সহচর এবং তাঁদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা এবং হিংসা থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা নির্দেশপ্রাপ্ত, তাই আমরা সকল সাহাবীকেই ভালোবাসি এবং তাঁদের প্রতি দ্বেষ, শত্রুতা থেকে বিরত থাকি। যেহেতু, এইরূপ শত্রুতা প্রকারান্তরে নবীয়ে করিম স. পর্যন্ত উপনীত হয়। যাঁরা সত্যের উপরে ছিলেন তাঁদেরকে সত্য বলি। আর যাঁরা ভুলের উপরে ছিলেন, তাঁদেরকে বলি ভুল। হজরত আলী রা. ছিলেন সত্যের উপরে। আর তাঁর বিরোধীপক্ষ ছিলেন ভুলের উপরে। এর চেয়ে অতিরিক্ত বলা বাচালতা মাত্র'।

৩১ আমল ঃ নামাজ প্রসঙ্গ

এ পর্যন্ত বিশুদ্ধ আকিদার বর্ণনা করা হলো। আকিদা বিশুদ্ধ করার পর আসে ফেকাহ্র নির্দেশাবলী অবগত হওয়ার দায়িত্ব। ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারাম

সুন্নত, মোস্তাহাব, মাকরূহ, মোবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। এ সমস্ত এলেম অর্জন করলেই কেবল দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং এলেম অনুযায়ী আমলও করতে হবে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন 'ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহ পাঠ করাও জরুরী জানবেন এবং নেক আমল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। 'নামাজ' দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ। তাই নামাজের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখছি। মনোযোগের সঙ্গে শুনুন।

প্রথমতঃ ভালোভাবে ওজু সম্পাদন করতে হবে। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে 'সুন্নত' প্রতিপালিত হয়। মাথা মুছবার সময় সমস্ত মাথা মুছতে হবে। কান এবং কাঁধ সাবধানতার সঙ্গে মুছবেন। পায়ের আঙুল খিলাল করার সময় বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল দ্বারা নিচ থেকে উপরের দিকে খিলাল করতে হবে (এরকম করা মোস্তাহাব)। মোস্তাহাবকে সামান্য ধারণা করবেন না। 'মোস্তাহাব' অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় কাজ। তাঁর পছন্দনীয় বস্তু। যদি সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও আল্লাহ্‌তায়ালার কোনো প্রিয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় এবং ওই কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়, তবে তাকেই যথেষ্ট জানবেন। এর মূল্য ওইরকম, যেমন কোনো ব্যক্তি ভাঙা মাটির পাত্রের বিনিময়ে অতি মূল্যবান মুনিমুক্তা ক্রয় করে। যেনো জড়বস্তুর বিনিময়ে প্রাপ্ত হয় রূহ বা আত্মা।

পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে এবং উত্তমরীতিতে ওজু সম্পাদনের পর মুমিনের মেরাজতুল্য 'নামাজ' পাঠের সংকল্প বা নিয়ত করবেন। খেয়াল রাখবেন, যেনো ফরজ নামাজ জামাত ছাড়া না পড়া হয়। ইমামের সঙ্গে প্রথম তাকবীরের সৌভাগ্য যেনো হাতছাড়া না হয়। মোস্তাহাব সময়ের মধ্যে নামাজ পাঠ করা উচিত। সুন্নত পরিমাণ ক্বেরাত বা কোরআন আবৃত্তি করা আবশ্যক। রুকু ও সেজদা ধীর ও শান্ত ভাবে সম্পাদন করবেন, যেহেতু অধিকাংশের মতে এরকম করা ফরজ কিংবা ওয়াজিব। কেয়াম বা দণ্ডায়মান হওয়ার সময় সোজা দাঁড়াবেন, যেনো অস্থিসকল নিজ নিজ স্থানে স্থিত হয়। রুকু থেকে দাঁড়াবার পর কিছুক্ষণ স্থির থাকা আবশ্যক। তা-ও প্রতিপালন করবেন। এরকম করা ফরজ, ওয়াজিব অথবা সুন্নত– এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। একইভাবে সেজদাদ্বয়ের মধ্যে বসার সময়ও কেয়ামের মতো কিছুক্ষণ শান্ত থাকা প্রয়োজন। রুকু এবং সেজদার মধ্যে তসবীহ্ পড়বার সর্বনিম্ন সংখ্যা তিনবার। ঊর্ধ্ব সংখ্যা সাত থেকে এগারো বার। সংখ্যার ব্যাপারেও মতভেদ আছে। ইমাম মোক্তাদীগণের অবস্থা অবগতিতে রেখে তসবীহ্ পাঠ করবেন। একা নামাজ পাঠকারী শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সর্বনিম্নসংখ্যক তসবীহ্ পাঠ করে, তবে তা লজ্জার বিষয়। একান্ত অক্ষম হলে অন্ততপক্ষে পাঁচ অথবা সাতবার পাঠ করা উচিত। সেজদা করবার সময় শরীরের যে অঙ্গ মাটির

কাছাকাছি তা প্রথমে মাটিতে স্থাপন করতে হবে। সুতরাং প্রথমে দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক, তারপর ললাট। হাঁটু এবং হাত স্থাপনের সময় ডান হাঁটু ও ডান হাত কিঞ্চিৎ আগে মাটিতে স্থাপন করবেন। সেজদা থেকে উঠবার সময় শরীরের যে অঙ্গ আকাশের দিকে সেই অঙ্গ আগে ওঠাতে হবে। অতএব আগে ওঠাতে হবে কপাল (তারপর নাক, হাত ও হাঁটু)। কেয়াম অবস্থায় সেজদা দেওয়ার স্থানে দৃষ্টিপাতকে স্থিরনিবদ্ধ রাখবেন (কোনো কিছুকে একত্রে সেলাই করে রাখলে তা যেমন স্থির থাকে)। রুকুর সময় দুই পায়ের মধ্যস্থলে, সেজদার সময় নাকের অগ্রভাগে এবং উপবেশনকালে দুই হাতে অথবা কোলে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবেন। এরূপ দৃষ্টিনিবদ্ধতা রক্ষা করতে পারলে মনোযোগের সঙ্গে নামাজ পাঠ করা সম্ভব হবে এবং অন্তরে নম্রতাও অর্জিত হবে। নবীয়ে করিম স. থেকে এরকম বর্ণিত হয়েছে। আবার রুকুর সময় হাতের আঙুল ফাঁক করে রাখা এবং সেজদার সময় মিলিত রাখাও সুন্নত। এর প্রতিও সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আঙুল পৃথক রাখা এবং একত্রিত রাখা বিনা কারণে নয়। নিশ্চয়ই এরকম আমলের উপকারিতা আছে, যার প্রতি লক্ষ্য করে সাহেবে শরা স. এরকম নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের জন্য তাঁর অনুসরণ তুল্য উপকার কোনোকিছুতেই নেই। ফেকাহের কিতাবসমূহে এসকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ স্থলে এর উল্লেখ ফেকাহের নির্দেশানুযায়ী আমলের প্রতি উৎসাহদান মাত্র। আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নবীয়ে রহমত স. এর অসিলায় ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস দুরস্ত করবার পর শরিয়তের নির্দেশানুযায়ী নেক-আমল করবার তওফীক বা সুযোগ প্রদান করুন। আমিন'।

৩২ এখলাছ ঃ তরিকা প্রসঙ্গ

আকিদা ও আমল বিশুদ্ধ করার পর 'এখলাছ' বা 'বিশুদ্ধতা' অর্জন করার কাজটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ কাজটি বিভিন্ন তরিকার সুফী পীর আউলিয়াগণের দায়িত্বের অন্তর্ভূত। তাঁদের তালিম-তরবিয়ত এবং সংসর্গ ছাড়া প্রকৃত এখলাছ

অর্জন সম্ভব নয়। অতীত বর্তমানের সকল কামেল বুজর্গানে দ্বীনের জীবনযাপন– ইতিহাসই এর প্রমাণ। কিন্তু এ পথে আসলের সঙ্গে নকলবাজরাও তরিকার নামে তাদের পার্থিব ব্যবসা বিস্তার করতে প্রয়াস পায়। তাছাড়া নাকেস (আধ্যাত্মিকতায় অপূর্ণ) ব্যক্তিও পীরের আসনে আসীন হয়ে এখলাছ অর্জনের মূল সাধনায় বহুরকম বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে। সুতরাং তরিকা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য যেমন জানা থাকা উচিত, তেমনি উচিত বিশুদ্ধ তরিকত চর্চার পূর্ণ ও স্বচ্ছ জ্ঞান।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন 'বিশ্বাস ও আমলের দুই বাহু অর্জনের পর আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ সহায় হলে সুফীগণের তরিকা গ্রহণ করতে হবে। তরিকা গ্রহণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এর ফলে আকিদা ও আমল ব্যতীত অন্য কোনো অতিরিক্ত বস্তু লাভ করা যায়। অথবা নতুন কিছু হস্তগত হয়। বরং উদ্দেশ্য এই যে, শরিয়তের বিশ্বাস্য বস্তুসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয় এবং কলবের সালামতি (প্রশান্তি) হাসিল হয়, যা কোনো প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনা ও কুমন্ত্রণায় নষ্ট হয় না। কেননা, দলিল-প্রমাণাদি কাঠনির্মিত পায়ের মতো এবং নিরেট দলিল উপস্থাপনকারীরা আন্ত রিক স্থিরতাশূন্য (সালিম কলবহীন)। 'সাবধান হও! আল্লাহ্‌র জিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়'। সূরা রা'দ ২৮ আয়াত। মোটকথা, আমলে সরলতা লাভ হয় এবং আলস্য ও আদেশ অমান্য করার কুপ্রবৃত্তি দূর হয়ে যায়। সুফীগণের তরিকায় সুলুক করার উদ্দেশ্য এ-ও নয় যে, অদৃশ্য আকৃতি প্রকৃতি ইত্যাদি দর্শন করে, অথবা বিভিন্ন নূর, রঙ ইত্যাদি দ্যাখে। এসকল কিছুও খেলতামাশার অন্তর্ভূত। প্রকাশ্য নূর (সূর্য, চন্দ্র) এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য সকল আকার আকৃতি কি অন্যায় করলো যে, এ গুলোকে ফেলে কঠোর সাধনার মাধ্যমে অদৃশ্য নূর ও আকার-আকৃতি দর্শনের অভিলাষী হতে হবে। যেহেতু, দৃশ্য-অদৃশ্য সকল জ্যোতি ও আকার আকৃতি– সবই আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্ট বস্তু এবং তাঁর পবিত্র জাতের প্রতি নিদর্শন মাত্র।

সুফীগণের মধ্যে প্রচলিত সকল তরিকার মধ্যে নকশবন্দিয়া তরিকা গ্রহণ করাই অধিক উপযোগী ও শ্রেয়। এই তরিকার বুজর্গগণ দৃঢ়তার সঙ্গে সুন্নতের পাবন্দী করেন এবং বেদাত থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা যদি সুন্নতরূপ সম্পদ লাভ করার পর আত্মিক অবস্থা (রূহানী হাল) কিছুই লাভ না করেন, তবুও সন্তুষ্ট থাকেন। পক্ষান্তরে, আত্মিক অবস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি দেখেন সুন্নত প্রতিপালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, তবে অসন্তুষ্ট হন'।

৩৩ তরিকা প্রসঙ্গ ঃ জিকির ও অন্যান্য বিষয়

জিকির শব্দের উদ্দেশ্য স্মরণ। কেবল উচ্চারণ নয়। একথা না বুঝতে পেরে অপূর্ণ (নাকেস) পীরেরা সশব্দে জিকির করতে থাকেন। স্মরণ বা জিকির কলব বা অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাপার। সুতরাং জিকির মানেই অন্তরের জিকির বা গোপন জিকির।

আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন–

'ওয়াজকুর রব্বাকা ফি নাফসিকা' (তুমি তোমার সত্তার মধ্যে গোপনে আল্লাহ্‌তায়ালার জিকির করো)। সুরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেন 'নকশবন্দী বুজর্গগণ জিকিরে জিহর বা উচ্চস্বরে জিকির করাকে 'বেদাত' বলে জানেন এবং এ ব্যাপারে নিষেধ করে থাকেন। এর দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করেন না। একদিন আমাদের পীর কেবলা হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ র. এর খানার মজলিশে আমি উপস্থিত ছিলাম। শায়েখ কামাল নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি আহারের শুরুতে তাঁর সামনে সশব্দে 'আল্লাহ্' নাম উচ্চারণ করলেন। আমাদের পীর কেবলা এতে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন 'তোমরা তাকে আমার খানার মজলিশে উপস্থিত হতে নিষেধ করে দিয়ো'। আমার পীর কেবলার নিকটেই আমি শুনেছি যে, খাজা নকশবন্দ র. বোখারার আলেমগণকে সঙ্গে নিয়ে হজরত আমীর কুলাল র. এর খানকা শরীফে গিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে, যেনো সকলে তাঁকে জিকিরে জিহর পরিত্যাগের আবেদন করেন। আলেমগণ হজরত আমির কুলাল র.কে বলেন জিকিরে জিহর বেদাত। এটা আপনি করবেন না'। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন 'আর করবো না'।

এই তরিকার উচ্চস্তরের বুজর্গবৃন্দ জিকিরে জিহরের ব্যাপারেই যখন এমন কঠোর, তখন নৃত্যগীত, লম্ফ-ঝম্প ইত্যাদির ব্যাপারে আর কি বলবো? শরিয়তবিগর্হিত কাজ দ্বারা যে সকল হালের উদ্ভব হয়, এ ফকির তাকে এস্তেদরাজ বা ছলনামূলক উন্নতি বলে জানে। কেননা, আহলে এস্তেদরাজ বা ছলনামগ্ন ব্যক্তিদেরও এক ধরনের আত্মিক অবস্থা ও প্রেরণা লাভ হয়ে থাকে এবং তওহীদে

অজুদী (একবাদ দর্শন) সম্পর্কিত আত্মিক বিকাশ (কাশ্‌ফ) হয় এবং বিশ্বের সকল বস্তুর আকার-আকৃতির আয়নায় আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি প্রতিচ্ছায়াতুল্য তাজাল্লি (আবির্ভাব) দৃষ্ট হয়ে থাকে। গ্রীকদেশীয় দার্শনিক এবং ভারতের যোগী-সন্ন্যাসীরাও এ বিষয়ে তাদের সমতুল। শরিয়তের এলেমসমূহের আনুকূল্য এবং হারাম ও সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে বহির্ভূতিই আত্মিক অবস্থা সত্য হওয়ার প্রমাণ। জানবেন যে, নৃত্য ও সঙ্গীত প্রকৃতপক্ষে খেলাধুলার মতো। আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বাক্যের ক্রীড়া ক্রয় করে' সূরা লোকমান, ৬ আয়াত।

এই আয়াত গানবাজনা নিষেধ উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর ছাত্র শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী হজরত মুজাহিদ র. বলেছেন 'বাক্যের ক্রীড়া অর্থ কিস্‌সাকাহিনী অর্থাৎ সঙ্গীত'। তাফসীরে মাদারেকে আছে, বাক্যের ক্রীড়া অর্থ কল্পকথা এবং সঙ্গীত। হজরত ইবনে আব্বাস রা. এবং হজরত ইবনে মাসউদ রা. সাহাবীদ্বয় শপথ করে বলতেন, এর অর্থ সঙ্গীত। মুজাহিদ র. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান 'যারা মিথ্যার মজলিশে হাজির হয় না' অর্থাৎ গানের জলসায় উপস্থিত হয় না'। ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদি র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন 'যে ব্যক্তি আমাদের এ যুগের কোরআন পাঠকারীকে বলে 'সুন্দর আবৃত্তি করলো'– সে কাফের হবে এবং তার স্ত্রী তালাকে বায়েন হবে। তার সকল সৎকাজ ও সওয়াব আল্লাহ্‌তায়ালা ধ্বংস করবেন।

ইমাম আবু নসর দবুছী র. কাজী জহিরউদ্দিন খাওয়ারজামী র. থেকে বর্ণনা করেছেন 'যে ব্যক্তি গায়কদের নিকট থেকে গান শুনবে, কিংবা কোনো হারাম কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করবে– একাজ সে বিশ্বাসের সঙ্গে করুক অথবা অবিশ্বাসের সঙ্গে, মোরতাদ হয়ে যাবে। কারণ, সে শরিয়তের হুকুমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। শরিয়তের হুকুম বাতিলকারী মুজতাহিদ ইমামগণের মতে ইমানদার থাকে না। এদের ইবাদত আল্লাহ্‌পাক কবুল করেন না এবং এদের সকল সৎকাজকে আল্লাহ্‌তায়ালা ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ্‌পাক রক্ষা করুন। সঙ্গীত হারাম ও অবৈধ। এ বিষয়ে কোরআন মজীদ, হাদিস শরীফের গ্রন্থাবলী এবং ফেকাহর পুস্তকসমূহে এত বেশী বিবরণ রয়েছে যে, তা অপসারিত করা কঠিন। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি মনসুখ বা পরিত্যক্ত হাদিস কিংবা সাজ বা কদাচিৎ বর্ণিত রেওয়ায়েতকে সঙ্গীত বৈধ করার পক্ষে বর্ণনা করে, তবে তা ধর্তব্যই নয়। কেননা, কোনো ফেকাহবিদ ইমাম কোনো যুগেই সঙ্গীতকে মোবাহ বা বিধেয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেননি এবং নৃত্য ও পদক্রীড়া জায়েয রাখেননি। ইমাম জিয়াউদ্দিন শামী র. এর 'মুলতাকাত' পুস্তকে এরকম বলা হয়েছে।

সুফীগণের আমল হালাল হারাম প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে দলিল নয়। এইমাত্র যে, আমরা তাঁদেরকে তাঁদের আত্মিক অবস্থার প্রাবল্যের (মাগলুবুল হাল) কারণে তাঁদেরকে মাজুর বা অক্ষম বলে জানি, তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করা থেকে বিরত থাকি এবং তাঁদের শেষ অবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সোপর্দ করি। এ সকল ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা র., ইমাম আবু ইউসুফ র. এবং ইমাম মোহাম্মদ র. এর কথার মূল্য আছে। কিন্তু স্বনামধন্য সুফী হওয়া সত্ত্বেও শায়েখ আবু বকর শিবলী র. অথবা শায়েখ আবুল হাসান নূরী র. এর কাজ এক্ষেত্রে মূল্যবান নয়। এ যুগের অপক্ক সুফীরা নিজ পীরদের কাজকে উপলক্ষ করে নাচ গানকে ইবাদততুল্য করে নিয়েছে। কালাম মজীদের বর্ণনা এ অবস্থারই ইঙ্গিত– 'উহারাই ওই ব্যক্তি, যারা ক্রীড়া-কৌতুককে নিজেদের ধর্ম করে নিয়েছে'। সূরা আনআম, ৭০ আয়াত।

পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহ থেকে জানা গেলো যে, যে ব্যক্তি হারাম কাজকে উত্তম জানে, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং 'মোরতাদ' এ পরিণত হয়। অতএব, চিন্তা করে দেখা দরকার যে, নৃত্যসঙ্গীতের মজলিশের সম্মান করা এবং তাকে আবার উপাসনাতুল্য জানা কিরূপ কদর্য এবং দূষণীয় কাজ। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ যে, আমাদের পীরানে কেরাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) এরকম কাজে লিপ্ত নন এবং আমরা যাঁরা তাঁদের অনুসরণকারী, তাঁরাও এ ব্যাপারে মুক্ত।

আলহামদুলিল্লাহি আলা জালিক। সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রসুলশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। তাঁর নবী ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি। তাঁর সম্মানিত সহচরবৃন্দ, পবিত্র বংশধর, পরিবার-পরিজন এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসরণকারী আউলিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি

। আল্লাহুম্মা আমিন।

বহুদিন থেকে অন্তরে একান্ত ইচ্ছা ছিলো যে, একমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অটুট, অকাট্য এবং অক্ষয় আকিদা বিশ্বাস সমকালীন সহজ ভাষায় পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করি। আল্লাহ্‌পাক নগণ্যাতিনগণ্য এই অযোগ্য ফকিরের ইচ্ছা আজ ফলবতী করলেন। 'ইসলামী বিশ্বাস' রচনার কাজ আজ শেষ হলো। আল্লাহ্‌পাক গ্রন্থকারের সিলসিলার সকল পীরানে কেরামের মতো তাঁকে এবং তাঁর কওমের সকল অধিবাসীকে আহলে সুন্নত জামাতের আকিদা বিশ্বাসের উপর অটল রাখুন এবং কাদিয়ানি, মওদুদী, ওহাবী, শিয়া, বাহাই ইত্যাদি গোমরাহ ফেরকাদের নিশ্চিহ্ন করে দিন। আমিন।

যে সকল পুস্তকের সহায়তায় 'ইসলামী বিশ্বাস' রচিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে–

১. মকতুবাত শরীফ, ২. তাকমীলুল ইমান, ৩. আকায়েদে নাসাফী, ৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৫. তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, ৬. কাসাসুল কোরআন, ৭. বোখারী শরীফ, ৮. হেকায়েতে সাহাবা, ৯. আশ্‌শিহাবুছ্ ছক্বিব, ১০. বাহারে শরিয়ত, ১১. নশ্‌রুততীব ইত্যাদি।

হাকিমাবাদ মসজিদে ইতেকাফ অবস্থায় এই পুস্তক **'ইসলামী বিশ্বাস'** রচনা শুরু হয়েছিলো ২১শে রমজান। শেষ হলো আজ ২৮ শে রমজান। হিজরী সাল ১৪১৪। ইংরেজী ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ সাল।

ওয়াস্‌সালামো আউয়ালাঁও ওয়া আখিরা।